সূচিপত্র

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৯ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
জুন-২০২৬

- কোরবানি তাওহীদি চেতনার উন্মেষ।
- দশই মুহার্‌রম জালিমের পতন ও নবীর মুক্তি।
- ১২৫৮ : বাগদাদের পতনের মর্মান্তিক ইতিহাস।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কেরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জুন ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৬.২৬	০৩:৪৫	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৮	১৬.০৬.২৬	০৩:৪৪	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৭	০৮:১৫
০২.০৬.২৬	০৩:৪৫	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪২	০৮:০৯	১৭.০৬.২৬	০৩:৪৪	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৫
০৩.০৬.২৬	০৩:৪৫	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:০৯	১৮.০৬.২৬	০৩:৪৪	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৬
০৪.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৩	০৮:১০	১৯.০৬.২৬	০৩:৪৫	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৬
০৫.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৭	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১১	২০.০৬.২৬	০৩:৪৫	১২:০০	০৩:১৮	০৬:৪৮	০৮:১৬
০৬.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৮	০৩:১৬	০৬:৪৪	০৮:১১	২১.০৬.২৬	০৩:৪৫	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৬
০৭.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৪	০৮:১২	২২.০৬.২৬	০৩:৪৫	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৭
০৮.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৫	০৮:১২	২৩.০৬.২৬	০৩:৪৬	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৭
০৯.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৫	০৮:১২	২৪.০৬.২৬	০৩:৪৬	১২:০১	০৩:১৯	০৬:৪৯	০৮:১৭
১০.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৮	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩	২৫.০৬.২৬	০৩:৪৬	১২:০২	০৩:২০	০৬:৪৯	০৮:১৭
১১.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৩	২৬.০৬.২৬	০৩:৪৬	১২:০২	০৩:২০	০৬:৪৯	০৮:১৭
১২.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৬	০৮:১৪	২৭.০৬.২৬	০৩:৪৭	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
১৩.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪	২৮.০৬.২৬	০৩:৪৭	১২:০২	০৩:২০	০৬:৫০	০৮:১৭
১৪.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৯	০৩:১৭	০৬:৪৭	০৮:১৪	২৯.০৬.২৬	০৩:৪৮	১২:০২	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭
১৫.০৬.২৬	০৩:৪৪	১১:৫৯	০৩:১৮	০৬:৪৭	০৮:১৫	৩০.০৬.২৬	০৩:৪৮	১২:০৩	০৩:২১	০৬:৫০	০৮:১৭

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية
তর্জুমানুল হাদীস
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث بينغلاديش
রেজি নং ডি.এ.১৪২
৩য় পর্ব
৯ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
জুন ২০২৬ ঈসায়ী
জিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৪৭-৪৮ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩ বাংলা
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারূক

সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক
চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক
মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন
শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান
মো: জামাল হোসেন
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১
ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ
বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
তর্জুমানুল হাদীস
রেজি নং ডি.এ.১৪২
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠
الهاتف : ٢٢٤٤٥٨٥٥١-٨٨٠٢+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،
المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،
رئيس التحرير: محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
❖ কোরবানি : তাওহীদ চেতনার উন্মেষ।.....৩

দারসুল কুরআন
❖ মুহাররম এর দশ তারিখ এক জালেমের পতনের দিন ও এক নবীর মুক্তির দিন।.....৪
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী

দারসুল হাদীস
❖ আশূরার সিয়াম বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দেয়।.৮
শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী

প্রবন্ধ :
❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র.....১১
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
❖ সালাফ চরিত।.....১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ ইসলামিয় দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত।.....১৫
ড. রেজাউল করিম মাদানী
❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।.....১৮
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ নির্মল হৃদয়।.....২২
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
❖ তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা।.....২৬
আব্দুর রউফ
❖ ঈদুল আযহায় মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয়।.....২৯
আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ
❖ ১২৫৮ : বাগদাদের পতনের মর্মান্তিক ইতিহাস।.....৩৪
যাহীন যামান

শুব্বান পাতা
❖ প্রগতির স্রোতে নারীর অশ্লীলতা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ।.....৩৭
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।.....৪১

সম্পাদকীয় الافتتاحية

কোরবানি : তাওহীদি চেতনার উন্মেষ

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি তাওহীদ– আল্লাহর একত্বে অবিচল বিশ্বাস। এই তাওহীদি চেতনার বাস্তব ও জীবন্ত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো কোরবানি। প্রতি বছর জিলহজ্জ মাসে বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা যে কোরবানি আদায় করেন, তা কেবল একটি আচার নয়; বরং এটি আত্মসমর্পণ, আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের গভীর এক প্রশিক্ষণ।

কোরবানির ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সেই অনন্য ত্যাগের কাহিনীতে। আল্লাহর নির্দেশে প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করার যে প্রস্তুতি, তা মানবেতিহাসে তাওহীদের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত। এখানে মূল শিক্ষা হলো, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা সর্বোচ্চ স্থানে থাকতে হবে; অন্য সবকিছু তার পরে।

আজকের প্রেক্ষাপটে কোরবানির তাৎপর্য আরো গভীরভাবে অনুধাবন করা জরুরি। অনেক সময় কোরবানি শুধুমাত্র সামাজিক প্রদর্শন বা প্রতিযোগিতার রূপ নেয়, যা এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে। অথচ কোরবানির মূল শিক্ষা হলো আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া অর্জন এবং দুনিয়াবি মোহ থেকে মুক্তি। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– আল্লাহর কাছে পশুর গোশত বা রক্ত পৌঁছায় না; পৌঁছায় কেবল বান্দার তাকওয়া।

কোরবানি আমাদের শেখায় ত্যাগের মানসিকতা। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ– সব ক্ষেত্রেই এ ত্যাগের চেতনা প্রয়োজন। ধন-সম্পদ, সময়, স্বার্থ– এসবের ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়াই তাওহীদি জীবনের মূল লক্ষ্য। কোরবানির মাধ্যমে একজন মুসলিম নিজের ভেতরের অহঙ্কার, লোভ ও স্বার্থপরতাকে কাটিয়ে ওঠার অনুশীলন করে।

এছাড়া কোরবানি সামাজিক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতারও প্রতীক। কোরবানির মাংস বণ্টনের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সাথে সম্পদের ভাগ হয়, যা ইসলামের ন্যায়বিচার ও মানবিকতার শিক্ষা বহন করে। এর মাধ্যমে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার হয়।

সর্বোপরি, কোরবানি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি তাওহীদি চেতনার পুনর্জাগরণ। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়– আমাদের জীবন, সম্পদ ও সবকিছুই আল্লাহর জন্য। তাই কোরবানির প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে, তা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করাই একজন মুমিনের দায়িত্ব।

এ তাওহীদি চেতনাই পারে ব্যক্তি ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক, আল্লাহভীরু সমাজ গড়ে তুলতে।

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

মুহার্‌রাম এর দশ তারিখ এক জালিমের পতনের দিন ও এক নবীর মুক্তির দিন।

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী*

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ০ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ০ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ০ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ০ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ০ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ০ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ০ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ০ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ০ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ০ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ০ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ০ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ০ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ০ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ০ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ০ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

আয়াতগুলোর সরল অনুবাদ : আর আমি মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহী পাঠালাম তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতেই রওনা দাও; কেননা তোমাদেরকে ধরার জন্য তোমাদের পিছে পিছে তারা আসবে; যাতে তোমরা সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছানোর আগে তারা তোমাদেরকে ধরতে না পারে। ফেরাউনের কাছে যখন বনী ইসরাঈলের রওনা দেওয়ার সংবাদ পৌঁছল, তখন সে তার রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে সেনা সংগ্রহের জন্য লোক পাঠালো। ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে উৎসাহ দিয়ে বলল: মূসার সাথে পলায়নকারী বনূ ইসরাঈলের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তারা আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করে এবং আমাদের অনুমতি ছাড়া বের হয়ে আমাদের অন্তর ক্রোধে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। তাদের থেকে আমাদের সবাইকে সতর্কতার সাথে প্রস্তুতি নিতে হবে, তারা আমাদের সকলের শত্রু। অতঃপর আমি ফেরাউন ও তার লোকজনকে বের করে আনলাম বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা ঘেরা মিসরের ভূমি থেকে এবং ধনভাণ্ডার ও বিলাসবহুল বাড়িঘর থেকে এভাবে আমি সেগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম বনূ ইসরাঈলকে। ফেরাউন তার দলবল নিয়ে মূসা ও তার লোকদের নিকট পৌঁছল সূর্যোদয়ের সময়। অতঃপর যখন উভয়দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসা আলাইহিস সালাম-এর লোকেরা বলল : আমরাতো ধরা পড়ে যাব। মূসা তাদেরকে সাহস দিয়ে বললেন : কখনই না, আমরা ধরা পড়বো না। আমার সাথে রয়েছেন আমার রব, তিনি শিগগিরই মুক্তির পথ দেখাবেন। তখন আমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ওহী করলাম : তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো, লাঠির আঘাতে সমুদ্র ফেটে সেখানে বারটি পথ তৈরি হল, প্রত্যেকটি পথ বড় বড় পাহাড়ের মতো। সেই পথে মূসা ও তার লোকজন প্রবেশ করল। অতঃপর ফেরাউন ও তার লোকজনকে আমরা ঐ জায়গার কাছে নিয়ে আসলাম, তারাও সেখানে প্রবেশ করল। আর আমরা মূসা ও তার লোকজন সবাইকে মুক্ত করলাম। অতঃপর ফেরাউন ও তার লোকজনকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এ ঘটনাতে শিক্ষা ও নির্দশন রয়েছে, অথচ তাদের অধিকাংশই ঈমান আনেনি। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিধর ও দয়ালু।[১]

আয়াতগুলোর উৎস ও সংখ্যা : বক্ষমান আয়াতগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের ২৬ নং সূরা, সূরা শু'আরা থেকে চয়নকৃত। আয়াতগুলোর সংখ্যা সতেরটি, বায়ান্ন নং আয়াত থেকে আটষট্টি নং আয়াত পর্যন্ত।

আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত : মহান আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার প্রমাণের বর্ণনা, দ্বিতীয়ত : মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যালেম ও কাফের মিসরের তৎকালীন শাসক

* উস্তাযুল ফিকহ ওয়াল হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

[১] সূরা আশ-শু'আরা আয়াত : ৫২-৬৮।

ফেরাউন ও তার অনুসারীদের অত্যন্ত ভয়ংকর ও করুণ পরিণতি এবং তাদের ওপর আল্লাহর কঠিন শাস্তির বর্ণনা, তৃতীয়ত : আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের মুক্তি এবং তাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা।

আয়াতগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত দারস : ফেরাউন ছিল মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় কাফের। সে তার রাজ্যের প্রজাদেরকে একত্রিত করে নিজেকে তাদের মহান রব দাবী করে[২]। সে এতেই ক্ষ্যান্ত ছিল না বরং রাজ্যের লোকদেরকে সে তার নিজের ইবাদতের দিকে আহব্বান করে বলেছিল, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো উপাস্য আছে বলে আমি জানি না।[৩] সে লোকদেরকে তার পবিত্রতা বর্ণনা করতে ও মহত্ব ঘোষণা করার প্রতি আহব্বান করেছিল। সে তার প্রজাদেরকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল, ফলে তারা অন্ধ ভক্ত ছিল।[৪] সে তার সেনাবাহিনীকে বিপথগামী করে রেখেছিল, ফলে তারা তাকে সহযোগিতা করত, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সাথে দুশমনি করত, মানুষদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। শুধু তাই নয়, সে নিজের ক্ষমতা স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনূ ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করে হত্যা করত এবং তাদের কন্যা সন্তানদেরকে বাঁচিয়ে রেখে তাদেরকে অপমানজনক, কষ্টদায়ক ও মানবেতর জীবনে ঠেলে দিত।[৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদের ধর্মের আলোকে অনস্বীকার্য জ্ঞাত বিষয় হলো, ফেরাউন সবচেয়ে বড় কাফের বরং আল্লাহ কুরআনে খাস নাম ধরে ফেরাউনের চাইতে বড় কোনো কাফেরের ঘটনা বর্ণনা করেননি এবং ফেরাউনের কুফরি, সীমালঙ্ঘন ও অহংকারের চেয়ে বড় আর কোনো কাফের সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।[৬]

ফেরাউনের রাজ্য মিসরে আল্লাহর রাসূল মূসা আলাইহিস সালাম দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করে তাকে ও তার প্রজাদেরকে বিভিন্ন দলীল প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফেরাউন সত্য গ্রহণ করেনি বরং সে তার দম্ভ-অহংকার এবং একগুঁয়েমিতে অটল ছিল। তখন আল্লাহ তাকে ও তার লোকজনকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং নবী মূসা ও তার সাথীদেরকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তার নবী মূসাকে রাতের বেলা গোপনে মিশর থেকে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন; যাতে শত্রুরা তাদেরকে ধরে ফেলতে না পারে। আল্লাহ চাইলে মিসরের যমীনেই ফেরাউন ও তার দলবলকে শেষ করে দিতে পারতেন এবং সেখানে নবী মূসা ও অনুসারীদেরকে সম্মানের সাথে বসবাস করাতে পারতেন কিন্তু তিনি তা না করে নবী মূসা ও মুমিনদেরকেই মিসর ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। এতে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হতে পারে, বহু সংখ্যক মৃত লাশ স্থলভাগের ওপর থাকলে পরিবেশ দুষণ হত, তাই তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে আল্লাহ পরিবেশ রক্ষা করেছেন। আরো একটি উদ্দেশ্য হতে পারে, মুমিনদেরকে এই শিক্ষা দেয়া যে, আল্লাহর দীনের ওপর চলার জন্য যালেমদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা এবং সেজন্য নিজের চিরচেনা মায়াঘেরা বসতবাড়ি ছেড়ে যাওয়াই কল্যাণকর, যদিও তা মনোকষ্টের কারণ, যেমন আমাদের নবী হিজরতের সময় বার বার মক্কার দিকে ফিরে চোখের পানি ফেলছিলেন এবং আরো একটি বড় উদ্দেশ্য হতে পারে, তা হলো আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় মুমিনদেরকে ছড়িয়ে দিয়ে দ্বীনকে সম্প্রসারণ করতে চান। তবে ফেরাউন ধ্বংস হওয়ার পরে একটা সময়ে বনূ ইসরাঈল আবার মিসরে ফিরে এসে মিসরের উত্তরাধিকারী হয়েছিল।

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলেই সবকিছু করতে পারেন তা সত্ত্বেও তিনি মুমিনদেরকে রাতে বের হওয়ার কৌশল ও পরিকল্পনা দিয়েছেন। অতএব মুমিনদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় সতর্ক থাকতে হবে এবং উপকরণ গ্রহণ করে সর্বপ্রকার কাজ ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহই সব করে দিবেন, এই কথা বলে, কাজ না করে বা উপকরণ গ্রহণ না করে ঘরে বসে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরতের ঘটনাতে আমাদের জন্য আরো বড় শিক্ষা রয়েছে।

---

[২] সূরা আন-নাযিআত আয়াত : ২৩-২৪।
[৩] সূরা আল-কসাস আয়াত : ৩৮।
[৪] সূরা আয-যুখরুফ আয়াত : ৫৪।
[৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৪৯০।
[৬] মাজমূউল ফাতাওয়া-১২৫।

ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা করে থাকে, আর এজন্য ফেরাউন তার বাহিনী প্রস্তুত করে তাদের পলায়নরত মুসলিমদেরকে নিঃশ্বেষ করার জন্য উস্কে দেয় যেটা ওপরের কয়েকটি আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যালেম যত বড়ই হোক, যত প্রতাপশালীই হোক, তার যুলুমই তাকে শেষ করে দেয়, আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহর অবাধ্যতা ও আল্লাহর বান্দাদের ওপর অত্যাচার করার কারণে আল্লাহ বাদশার বাদশাহী ধ্বংস করেন এবং নেয়ামত কেড়ে নেন।

শত্রুকে ভয় পাওয়া ঈমানের পরিপন্থী নয়, বরং এটা স্বাভাবিক বিষয়। এজন্য মূসার অনুসারীরা ভয় পেয়েছিল যে, তারা শত্রুদের দ্বারা ধৃত হবেন। এবং এই উম্মতের নবীর পরে সবচেয়ে বড় ঈমানদার আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হিজরতের সময় শত্রুদের হাতে ধরা পড়ার ভয় পেয়েছিলেন। অতএব শত্রুর ভয় স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু মুমিনরা আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের ওপর ভরসা করে ভয়কে জয় করবে এবং মুমিনরা পরস্পরকে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে অভয় দিবে, যেমন মূসা আলাইহিস সালাম তার অনুসারীদেরকে অভয় দিয়েছিলেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অভয় দিয়েছিলেন।

লাঠির আঘাতে সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো বড় বড় পথ তৈরি হওয়া একদিকে যেমন আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে, অন্যদিকে আমাদের কাজ ও উপকরণ গ্রহণ করার কথা শিক্ষা দেয়; কারণ আল্লাহ চাইলে লাঠির আঘাত ছাড়াও সমুদ্রের বুকে রাস্তা তৈরি করতে পারেন।

আল্লাহ যালেমকে ক্ষণিকের জন্য ছাড় দেন ও অবকাশ দেন কিন্তু তাকে ছেড়ে দেন না। এজন্য আল্লাহ ফেরাউন ও তার দলবলকে ছাড় দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের কাছে এনে সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে মারেন। আল্লাহর কৌশল সবচেয়ে বড় কৌশল! তিনি সমুদ্রের বুকের যে পথ ও রাস্তা দিয়ে নবী মূসা ও মুমিনদেরকে মুক্তি দিলেন সেই একই রাস্তায় ফেরাউন ও তার কাফের বাহিনীকে ধ্বংস করেন। এটাতে আল্লাহর হেকমত ও কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এত জানার পরেও অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। সুতরাং দাঈর কাজ হবে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার কাছে সাহায্য চেয়ে মানুষদের কাছে কুরআন সুন্নাহকে হেকমতের সাথে উপস্থাপন করবে। যদি তার আহব্বানে কেউ সাড়া না দেয়, সেটাতে সে আফসোস করবে না; কারণ অনেক নবী অনুসারী পাননি। এগুলো মাথায় নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

প্রচণ্ড ক্ষমতাধর, প্রতাপশালী ফেরাউন ও তার দলবলকে সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে মেরে ধ্বংস করাটা মহান আল্লাহর পরাক্রমশালিতার প্রমাণ বহন করে। অন্যদিকে নবী মূসা ও তার অনুসারীদেরকে মুক্ত করাটা মাজলুমের প্রতি মহা-দয়াবান আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ মাজলুম মুমিনদেরকে বিশেষভাবে রহমত করেন।

মূসা আলাইহিস সালাম এর মুক্তির দিনটি ছিল মুহাররম মাসের দশ তারিখ। নবী মূসা আলাইহিস সালাম অত্যাচারী ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ মুহার্‌রম এর দশ তারিখ তথা আশূরার সিয়াম রাখতেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (لما قدم النبي ﷺ المدينة، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه.)

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনাতে আগমন করলেন, তিনি মদিনাতে ইহুদীদেরকে মুহার্‌রমের দশ তারিখ তথা আশূরার সিয়াম রাখতে দেখলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা কেন এ দিনে সিয়াম রাখ? তারা বলল, এই দিনে আল্লাহ মূসা ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনের ওপর বিজয় দিয়েছিলেন। তাই আমরা তার সম্মানে এই দিনে সিয়াম রাখি। তখন নবী ﷺ বললেন: তোমাদের চেয়ে আমরা মূসার বেশি নিকটতম। অতঃপর রাসূল ﷺ এই দিনের সিয়ামের আদেশ দেন।[৭]

[৭] সহীহ বুখারী হা : ৩৯৪৩।

বুখারীর অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস থেকে এসেছে :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه.

'রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনাতে আগমন করলেন, তিনি মদিনাতে ইহুদীদেরকে মুহার্‌রমের দশ তারিখ তথা আশূরার সিয়াম রাখতে দেখলেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা কেন এ দিনে সিয়াম রাখ? তারা বলল, এই দিনে আল্লাহ মূসাকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউনকে দলবলসহ ডুবিয়েছিলেন। তাই মূসা আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ এদিনে সিয়াম পালন করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের চেয়ে আমরা মূসার বেশি নিকটতম। অতঃপর রাসূল ﷺ এই দিনের সিয়ামের আদেশ দেন।'[৮]

এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত পেলে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ সলাত পড়া বা সিয়াম রাখা বৈধ। আর আশূরার সিয়াম পালন করা আমাদের জন্য মুসতাহাব ও সুন্নাহ।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يكفر السنة التي قبله.

আশূরার সিয়ামের বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি যে, তিনি এর মাধ্যমে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৯]

তবে ইহুদীদের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে দশ তারিখের আগে অথবা পরে একটি সিয়াম রাখতে হবে। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে নির্দেশনা রয়েছে এবং তিনি বলেছিলেন, যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে নয় তারিখেও সিয়াম রাখব।

যদিও মূসা আলাইহিস সালাম এর মুক্তির দিনটি ছিল মিসরের দশ তারিখে এবং মিসরের জালেম হতে তবুও আমাদেরকে সিয়াম পালন করতে হবে আমাদের দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমাদের দেশের দশই মুহার্‌রম এবং তার আগে অথবা পরে একদিন। একইভাবে আরাফার সিয়ামও প্রত্যেক দেশের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ৯ই যিল হজ্জ। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

আয়াতগুলো থেকে মৌলিক শিক্ষা :

১. আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, তার ক্ষমতার সামনে পৃথিবীর সকল ক্ষমতা তুচ্ছ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাকে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই।

২. যালেমের শেষ পরিণতি খুব ভয়াবহ সে যত ক্ষমতাধরই হোক না, তার শেষ রক্ষা নেই, সে আল্লাহর হাত থেকে পালাতে পারে না।

৩. আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদেরকে সাহায্য করেন, তাদের ওপর রহমত করেন। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

আল্লাহর রহমতে দারসুল কুরআন সমাপ্ত করতে সক্ষম হলাম। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর। ❑❑

আশূরা কেন্দ্রিক শরী'আত বিরোধী কিছু কাজ

১. হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন।

২. মাতম করা।

৩. মর্ছিয়া গাওয়া।

৪. তা'যিয়া করা।

৫. নিজের উপর আঘাত করা ও কাপড় ছেঁড়া ।

৬. সাহাবী-তাবেঈদেরকে মন্দ বলা।

৭. বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা।

৮. কারবালার ঘটনাকে হক ও বাতিলের লড়াই মনে করা।

৯. হুসাইনের মাথা ছয়টি দেশে প্রেরিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা।

[৮] সহীহ বুখারী হা : ৩৩৯৭।
[৯] সহীহ মুসলিম হা : ১১৬২।

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

আশূরার সিয়াম বিগত এক বছরের পাপ মোচন করে দেয়

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্রাহিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের পাপ মোচন এবং তাদের সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উত্তম মৌসুম নিয়ে আসেন, সালাত সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী ও প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ এর ওপর যিনি মুহাররম মাসের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, আশূরার সিয়াম পালন করে গেছেন। তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদের পাপ মোচন করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মৌসুম নিয়ে আসেন, তার মধ্যে অন্যতম মুহার্‌রম মাস, এই মাসের সিয়ামের অনেক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে, বিশেষ করে মুহাররম মাসের দশ তারিখ সিয়াম পালন করার অনেক মর্যাদা রয়েছে যেটাকে আশূরার সিয়াম বলা হয়। এর ফযীলত এবং এর গুরুত্ব এবং এর ইতিহাস নিয়ে তর্জুমানুল হাদিসের এ সংখ্যায় দারস প্রদান করব ইনশাআল্লাহ। হাদীসটি নিম্নে দেয়া হলো :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صِيَامُ يَـوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

হাদীসের অনুবাদ : আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী ﷺ বলেছেন: আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশা পোষণ করি যে, তিনি আশূরার সিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ্) ক্ষমা করে দিবেন।

❖ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

যে সকল মুহাদ্দিস হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

হাদীসটি ইমাম আহমাদ, বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, জামে আত-তিরমিজি ও ইবনু মা-জাহ বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচিতি : আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী- তাঁর নাম সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, তাঁর নাম ছিল হারিস ইবনু রিবঈ। আবার কেউ বলেছেন, নু'মান ইবনু রিবঈ। অন্য মত অনুযায়ী, তাঁর নাম ছিল আমর ইবনু রিবঈ। তবে প্রসিদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো : হারিস ইবনু রিবঈ ইবনু বালদামাহ ইবনু খান্নাস ইবনু সিনান ইবনু উবাইদ ইবনু 'আদী ইবনু গনম ইবনু কা'ব ইবনু সালামাহ আস-সুলামী আল-মাদানী।

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন মদীনাবাসী আনসার সাহাবী, এবং বনু সালামাহ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আশূরার সিয়ামের আরো ফযিলত :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَـا رَأَيْـتُ النَّبِـيَّ صـلى الله عليـه وسـلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُـورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

বর্ণনাকারী ইব্নু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে 'আশূরার দিনের সিয়ামের ওপরে অন্য কোনো দিনের সিয়ামকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রামাযান মাস (এর ওপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)।[১০]

আশূরার প্রথম দশ দিনের গুরুত্ব :

সালাফে সালেহীন তিনটি দশককে অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতেন। এগুলো ছিল ইবাদতে পরিশ্রম ও আমলের জন্য বিশেষ ফযীলতপূর্ণ মৌসম। আবূ উসমান আন-নাহদী رحمه الله সালাফদের থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। সেই তিন দশক হলো-

১. রমাযানের শেষ দশ দিন- লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে।

২. যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন - কারণ এ সময়ের নেক আমলের বিরাট ফযীলত রয়েছে এবং এর মধ্যেই রয়েছে আরাফার দিবস।

[১০] সহীহ বুখারী হা : ২০০৬।

৩. মুহাররমের প্রথম দশ দিন- কেননা এর মধ্যে রয়েছে ইয়াওমে আশূরা।

এই আসারটি ইমাম ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী رحمه الله তাঁর কিতাবুস সালাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবূ উসমান আন-নাহদী رحمه الله বলেন : "তাঁরা তিনটি দশককে বিশেষ মর্যাদা দিতেন :

মুহাররমের প্রথম দশ দিন, যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন এবং রমাযানের শেষ দশ দিন।

ভালো মৌসমগুলোকে আমাদের কিভাবে স্বাগত জানো দরকার? তার প্রস্তুতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় নিচে দেওয়া হলো :

অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা : পাপ ও সীমালঙ্ঘন থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, কারণ এগুলো মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করে এবং তাঁর আনুগত্যের পথে অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

আন্তরিক নিয়ত ও সংকল্প : এই সময়গুলোকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর জন্য আন্তরিক নিয়ত করা এবং ইবাদত করার ও উদাসীনতা পরিহার করার সংকল্প গ্রহণ করা।

এই মৌসুমে পৌঁছানোর জন্য প্রার্থনা : সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, যেন তিনি আমাদের কল্যাণের মৌসুমগুলো উপভোগ করার সুযোগ দেন এবং সেই সময়ে ভালোভাবে ইবাদতের কাজগুলো সম্পাদনে আমাদের সাহায্য করেন।

ইবাদতের পরিকল্পনা : সময় যাতে নষ্ট না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপের (সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর স্মরণ, দান, পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখা) একটি সময়সূচি তৈরি করা।

মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি : আংশিক বা ঐচ্ছিক সিয়াম (যেমন আরাফার সিয়াম পালনের মাধ্যমে মৌসমকে স্বাগত জানানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া।

জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব উপলব্ধি করা : এই উপলব্ধি করা যে, জীবনের এই সময়গুলো এমন সুযোগ যা হয়তো আর ফিরে আসবে না এবং এগুলো নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার পর্যায়।

ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গ : এমন ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা, যারা আপনাকে এগুলো করতে পালনে সাহায্য করে এবং এই সুযোগগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

আশূরার ইতিহাস : আশূরার সিয়াম ইসলামের একটি প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। এর ইতিহাস বহু পুরোনো- মূসা عليه السلام-এর যুগ থেকে শুরু হয়ে রাসূল ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত এসেছে। নিচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এর ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো

আশূরা কী? তার পরিচিতি : "আশূরা" (عاشوراء) শব্দটি "عشرة" (দশ) থেকে এসেছে। অর্থাৎ মুহাররম মাসের ১০ তারিখকে আশূরা বলা হয়। এটি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দিন।

১. মূসা عليه السلام-এর যুগে আশূরা, আল্লাহ তা'আলা এই দিনে মূসা عليه السلام ও বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের যুলুম থেকে মুক্তি দেন এবং ফেরাউন ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন। এ কারণেই মূসা عليه السلام আল্লাহর শুকরিয়া আদায়স্বরূপ এই দিনে সিয়াম পালন করতেন। রাসূল ﷺ বলেছেন :

هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى.

"এটি একটি মহৎ দিন। এ দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই মূসা এ দিনে সিয়াম পালন করেছিলেন।"

হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

২. জাহেলিয়াত যুগে কুরাইশদের আশূরার সিয়াম।

রাসূল ﷺ নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বেও কুরাইশরা আশূরার সিয়াম পালন করত। সম্ভবত তারা ইবরাহীম عليه السلام-এর শরী'আতের কিছু অবশিষ্ট আমল হিসেবে এটি পালন করত। 'আয়িশা رضي الله عنها 'আনহা বলেন : জাহেলিয়াত যুগে কুরাইশরা আশূরার সিয়াম পালন করত, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তা পালন করতেন।"[১১]

৩. মদীনায় হিজরতের পর রাসূল ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন দেখলেন ইয়াহূদীরা আশূরার সিয়াম পালন করছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা এ সিয়াম কেন পালন কর?" তারা বলল : এ

[১১] সহীহ মুসলিম।

দিন আল্লাহ মূসা ও বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন : فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. "মূসার অনুসরণ করার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অতঃপর তিনি নিজে সিয়াম রাখলেন এবং সাহাবীদেরও সিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন।[১২]

৪. আশূরার সিয়াম একসময় ফরয ছিল। রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার আগে আশূরার সিয়াম মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব ছিল।

সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে ঘোষণা দিতে পাঠালেন "যে খেয়ে ফেলেছে, সে যেন বাকি দিন না খায়। আর যে খায়নি, সে যেন সিয়াম পূর্ণ করে। কারণ আজ আশূরার দিন।"[১৩]

৫. রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর। দ্বিতীয় হিজরিতে আশূরার সিয়াম ফরয থেকে মুস্তাহাব হয়ে যায়।

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রমযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর রাসূল ﷺ বলেছেন- 'যে ইচ্ছা সিয়াম পালন করবে সে আশূরার সিয়াম রাখবে, আর যে ইচ্ছা করবে না রাখবে না।'[১৪]

৬. ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার নির্দেশ : প্রথমে শুধু ১০ মুহাররম সিয়াম রাখা হতো। পরে রাসূল ﷺ ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার জন্য ৯ তারিখও রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন : لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ "আমি যদি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই ৯ তারিখও সিয়াম রাখব।"[১৫]

কিন্তু পরবর্তী বছর আসার আগেই রাসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেন।

৭. আশূরার সিয়ামের উত্তম পদ্ধতি : উলামাগণ হাদীসগুলো একত্র করে বলেছেন :

সিয়াম রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি ৯ ও ১০ মুহাররম সিয়াম রাখা। আরো উত্তম বলা হয়েছে : ৯, ১০ ও ১১ মুহাররম - তিন দিন। কমপক্ষে শুধু ১০ মুহাররম।

৮. আশূরার সিয়াম শুক্রবার বা শনিবারে পড়লে : আশূরা যদি শুক্রবার বা শনিবারে পড়ে, তবুও আশূরার সিয়াম রাখা বৈধ এবং সুন্নাহ। কারণ এটি বিশেষ কারণযুক্ত সিয়াম। তবে উত্তম হলো এর সাথে আরেকটি দিন মিলিয়ে নেওয়া- যেমন ৯ বা ১১ মুহাররম।

৯. কারবালার ঘটনা ও আশূরা : ৬১ হিজরিতে এই দিনে হুসাইন বিন আলী শহীদ হন। এটি মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। তবে রাসূল ﷺ বা সাহাবায়ে কিরাম আশূরাকে শোক দিবস, মাতম, বুক পেটানো বা বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের দিন বানাননি। বরং শরীয়ত অনুযায়ী এ দিনের আমল হলো সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

সংক্ষেপে আশূরার ইতিহাস :

পর্যায়ক্রমিক ঘটনা, মূসা (আলাইহিস সালাম)- এর যুগ, ফিরআউনের ধ্বংস ও মূসার নাজাত, জাহেলিয়াত যুগ, কুরাইশদের সিয়াম পালন, মদীনায় হিজরত, ইয়াহূদীদের সিয়াম দেখা, ইসলামের শুরুতে আশূরার সিয়াম ওয়াজিব ছিল রামাযান ফরয হওয়ার পর আশূরা সুন্নাহ হয়ে যায়। শেষ নির্দেশ ৯ ও ১০ মুহাররম সিয়াম রাখা।

আশূরার বিদ'আতসমূহ :

হাফিয ইবনু রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "আশূরার দিনে আনন্দ-উৎসব করা, সাজসজ্জা করা এবং বিশেষভাবে গোসল করার ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে- তার কোনোটিই সহীহ নয়; এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস প্রমাণিত নয়। আর শোক প্রকাশ করা, মাতম করা ও বিলাপ করা- যেমন রাফেযীরা হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার) শাহাদাতের কারণে করে থাকে- এগুলোও পথভ্রষ্টতার কাজ এবং এমন লোকদের আমল, যারা দুনিয়ার জীবনেই বিভ্রান্ত হয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কখনোই কোনো নবী বা কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যুর দিনকে শোক ও মাতমের দিবস হিসেবে পালন করার বিধান দেননি। তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে তা কীভাবে বৈধ হতে পারে?!"[১৬]

আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাহ অনুযায়ী আশূরার সিয়াম পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।❑❑

---

[১২] সহীহ বুখারী।
[১৩] সহীহ বুখারী।
[১৪] সহীহ বুখারী।
[১৫] সহীহ মুসলিম।
[১৬] লাতায়িফুল মা'আরিফ (পৃষ্ঠা ১১৩)।

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবূ সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমরা যথাসময়ে মদিনা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে উড়াল দিলাম।

(প্রিন্স মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ বিমান বন্দর, মদিনা)

আমরা গত সংখ্যায় লিখেছি-মদিনাস্থ বিমানবন্দরের নাম প্রিন্স মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ বিমানবন্দর। আর জেদাস্থ বিমান বন্দরটি কিং আব্দুল আজিজ আন্তজার্তিক বিমানবন্দর নামে জেনেছি।

আকাশ পথে এর দূরত্ব প্রায় ৩২৩-৩২৫ কিমি. প্রায়। সরাসরি ফ্লাইটে গন্তব্যে পৌছতে সময় লাগে ২৫-৩০ মিনিট। কিন্তু টেকঅফ, অবতরণ ও বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার কারণে সেই ফ্লাইট সময় সাধারণত ৫০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিটের মধ্যে হয়। আমরা ঐ সময়ের মধ্যে জেদ্দা গিয়ে পৌঁছি।

❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

জেদ্দা সৌদি আরবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নগরী। এটি লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য মর্যাদাসম্পন্ন একটি শহর। মক্কা ও মদিনার প্রবেশদ্বার হিসেবে জেদ্দা যুগযুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আরব উপদ্বীপের সংযোগ রক্ষা করে আসছে।

জেদ্দা (Jeddah/Jidda) শব্দটি আরবি (جدّة) থেকে এসেছে। তার একটি প্রসিদ্ধ অর্থ হলো দাদী বা নানী। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মানবজাতির আদিমাতা হাওয়া আলাইহিস সালাম-এঁর কবর এখানে রয়েছে। এ বিশ্বাস থেকেই শহরটির নাম জেদ্দা হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। আর একটি মত অনুযায়ী, জেদ্দা শব্দের অর্থ সমুদ্রতীরবর্তী পথ বা উপকূলীয় স্থান, যা শহরটির ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শুধু সৌদি আরবের নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর।

(জেদ্দা কিং আব্দুল আজিজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)

জেদ্দা সৌদি আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। আয়তন ১,৬৮০ বর্গ কিমি.। প্রশাসনিকভাবে এটি মক্কা প্রদেশের অন্তর্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি গভর্ণরেট। সৌদি আরবের কুটনৈতিক রাজধানী হিসেবে জেদ্দার পরিচিতি দুনিয়াব্যাপী। রিয়াদে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলোর অধিকাংশ কনস্যুলেট ও কূটনৈতিক

কার্যালয় জেদ্দায় অবস্থিত। ওআইসি (ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা) এর সদর দফতর এখানে থাকায় এটি ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু।

বছর আটেক আগের কথা। আমার সহকর্মী ও তদানীন্তন দিনাজপুর সরকারী মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের অগ্রজা জেবুন্নেসার প্রয়াসে পরিবারের সদিচ্ছায় আমি বদলি হজে যাই।

দাগী আসামীদের শিরশ্ছেদের গ্রাউন্ড জেদ্দাতে। আমি পথ অতিক্রমকালে দেখলাম উন্মুক্ত চত্বর। সেখানে প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ব্যবস্থা আছে। চতুর্দিকে মানুষ দণ্ডায়মান হয়ে শিরশ্ছেদ দৃশ্য দেখবে। অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকার ভীতি সৃষ্টিতে এ দৃশ্য অব্যর্থবটিকা হিসেবে কাজ করে থাকে।

সালটা সম্ভবত ২০০৩। আমার পিতা হাজি মো: সেতাবউদ্দিন- এর ইনতেকালের বছর ২০০১। তাঁর প্রয়াণে আমাদের গোটা পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমার মমতাময়ী-মা (৯২) রীতিমতো মুষড়ে পড়েন। সে সময় আমাদের প্রচুর জমি ছিলো, কিন্তু আধুনিক পদ্ধতির আওতায় তখনো না আসার কারণে প্রাচুর্য ছিলো না। বর্গাদার ও নিজেদের সামান্য চাষবাসে প্রাপ্ত ফসলে পরিবার চলতো। তবে হ্যাঁ, বরকত ছিলো। আমার এখনো মনে আছে, আমরা অন্তত তিন বছরের পুরোনো চালের ভাত খেতাম। গ্রামাঞ্চলে তখন টোটকা চিকিৎসার আওতায় জ্বর হলে পুরোনো চালের ভাত খাওয়ানোর চল ছিল। সেই সূত্রে ভুক্তভোগীদের অনেকে আমাদের বাড়িতে চাল নিতে আসতো। প্রচুর ফলমূল অনায়াসলব্ধ ছিলো। এমনি একটা আবহ তখনকার সমাজে দেখা যেত।

যাহোক, আব্বার প্রয়াণের ২ বছর পর অর্থাৎ ২০০৩ সালে আম্মাকে নিয়ে হজ্জে আসি। তখনকার জেদ্দার হাজি টার্মিনাল এখনো অপরিবর্তীত আছে। প্রতিটি তাঁবুর অবস্থান এমনই যে, নম্বর না জানলে নিজ তাঁবু চেনা বড়ই কষ্টকর। সেবারে এমনি ধরনের এক মারাত্মক ঝুঁকির হাত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন।

আমাদের তাঁবুর সামান্য উত্তরে সম্ভবত : দ্বীনি আলোচনা হচ্ছিলো। আমি সেখানে যাই। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি আমার মমতাময়ী মা সেই আলোচনা স্থানে হাজির। অর্থাৎ তিনি ভুলে গেছেন, কোথায় তার তাঁবু। খুঁজতে গিয়ে ঐ মজমায় এসে পৌঁছেন এবং আমার সাথে দেখা হয়। আলৌকিকভাবে সে সাক্ষাৎ না হলে মাকে খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন হতো। হজ্জ থেকে ফেরার আমেজ ও আনন্দ দু'টি হারাতে হতো।

বিশালাকৃতির এই বিমান বন্দরে অবতরণের পরপর রাজকীয় অভ্যর্থনায় সিক্ত হলাম। মরুভূমির আরব তাঁবুর আদলে নির্মিত হজ্জ টার্মিনালটি, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সাদা বিশাল তাঁবুর শহর দাঁড়িয়ে আছে। বলাবাহুল্য এই ছাউনীগুলো বিশেষ ফাইবার গ্লাস ও টেফলন-আবৃত কাপড়ে তৈরি। প্রচণ্ড গরমেও ভেতরে পরিবেশ তুলনামূলকভাবে শীতল রাখতে সহায়তা করে। স্থপতিরা এমনভাবে নকশা করেছেন যাতে প্রাকৃতিক আলো ও বাতাসের ব্যবহার বাড়ে এবং শক্তির অপচয় কম হয়। বিস্তৃত পরিসরের এই বিমান বন্দটির জুড়ি মেলা ভার। বিমান বন্দরের বিভিন্ন অংশে আরবি জ্যামিতিক নকশা, প্রশস্থ খিলান। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও মার্জিত অলঙ্করণ। ইসলামী ঐতিহ্যের সোনালী অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একই সঙ্গে আধুনিক কাচ, ইস্পাত, আলোকসজ্জা এর আন্তর্জাতিক মানকে সমুন্নত করেছে।

বাংলাদেশ থেকে আমরা ছিলাম সংখ্যায় উনত্রিশজন। সকলেই বড়ই সাদাসিধে ও আন্তরিক। আমাদের সাথে বিমানের জনাকয়েক কর্মকর্তা, জনৈক সচিব ও তাঁর স্ত্রীর অসাধারণ বিনয় দৃষ্টে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।

চলবে ইনশাআল্লাহ ❑❑

সালাফ চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

পর্ব-৪

খোলাফায়ে রাশিদীন- এর যুগে যুগে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন :

যখন নবী ﷺ মৃতুবরণ করলেন এবং আবু বকর খিলাফতের দায়িত্বে আসীন হলেন, তখন সা'দ তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিলেন। অতঃপর যখন উসামা ইবনে যায়েদের সেনাবাহিনী সিরিয়া বিজয়ের জন্য মদিনা ত্যাগ করে, তখন আরব বেদুইন গোত্রগুলো মদিনার প্রতি লোভ করে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদিনার প্রবেশদ্বারগুলোতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, যারা প্রতিদিন সারা রাত মদিনার চারপাশে কাটাতো। তাদের মধ্যে ছিলেন আলী ইবনে আবি তালিব, যুবায়ের ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। পরবর্তীতে সা'দ রিদ্দার যুদ্ধে আরব বেদুইনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আবু বকরের সাথে শরীক হন।

ইরাকের ইমারাত :

আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ইরাক থেকে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আবু বকরের মৃত্যুর পর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ১৩ হিজরিতে আবু উবাইদ আস-সাকাফিকে ইরাকি সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু তার মেয়াদ ছিল স্বল্পস্থায়ী। মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়েছিল। অতঃপর তিনি সেতুর যুদ্ধে শহীদ হন। আবু উবাইদ আস-সাকাফির মৃত্যুর পর পারস্যরা তৃতীয় ইয়াজদিগার্ডের অধীনে পুনরায় সুসংগঠিত ও একত্রিত হয় এবং মুসলিম শাসনাধীন অমুসলিমরা মুসলিমদের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তাদের ভূমি থেকে মুসলিম কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে। এতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ওপর রাগান্বিত হন এবং ১৪ হিজরিতে মুহাররম মাসের প্রথম দিনে ইরাক অভিযান ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করার সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি মদিনায় আলী ইবন আবি তালিবকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি মদিনার বাইরে সিরার নামক একটি জলাশয়ের নিকট তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি পরামর্শ সভা আহব্বান করেন। এরই মধ্যে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য ঘোষণা করা হলো এবং আলীকে মদিনা থেকে ডেকে পাঠানো হলো। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে পরামর্শ করলেন এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ছাড়া সবাই তাঁর সঙ্গে ইরাকে যেতে রাজি হলো। আবদুর রাহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ভয় হচ্ছে, আপনি যদি সেখানে গিয়ে পরাজিত হন, তবে সারা দেশের মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, আপনার স্থলে অন্য একজন লোক পাঠিয়ে আপনার মদিনায় ফিরে যাওয়া উচিত। লোকেরা সা'দ ইবনে আওফের মতকে সমর্থন করলো। উমার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মতে আমাদের কাকে ইরাকে পাঠানো উচিত? ইবনে আওফ উত্তর দিলেন, আমি তাকে খুঁজে পেয়েছি। উমার জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? ইবনে আওফ উত্তর দিলেন, থাবা বিশিষ্ট সিংহ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বিন মালিক আয-যুহরি। উমার তাঁর পরামর্শ পছন্দ করলেন। অতঃপর তা অনুমোদন করলেন এবং সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তাকে ইরাক পাঠানোর পূর্বে একটি বিশেষ উপদেশ দিলেন, যা নিম্নরূপ :

হে সা'দ, এই বিষয়টি তোমাকে যেন ধোঁকা না দেয় যে, তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচা ও সঙ্গী বলা হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ মন্দকে মন্দ দিয়ে মোচন

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

করেন না; বরং মন্দকে ভালো দিয়েই মোচন করেন। আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া তাঁর সাথে কারো কোনো আত্মীয়তা নেই। সম্ভ্রান্ত ও উঁচু-নীচু সকল মানুষই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান। আল্লাহ তাদের রব এবং তারা তাঁর বান্দা। তারা তাদের ধার্মিকতার ও আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে যা আছে, তা লাভ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তাঁর নবুওয়াতের সময় থেকে শুরু করে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তুমি যেভাবে দেখেছো, সেভাবেই চিন্তা করো এবং তা আঁকড়ে ধরো। তোমার প্রতি এটাই আমার আদেশ। এটাই তোমার প্রতি আমার উপদেশ; যদি তুমি তা পরিত্যাগ করো এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তোমার আমল মূল্যহীন হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতঃপর যখন সা'দ উমারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলো, তখন তিনি তাকে পুনরায় ডেকে এনে বললেন, হে সা'দ! তুমি একটি কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছো। সুতরাং ধৈর্য ধরো, তোমার ওপর যে দায়িত্ব আপতিত হয়েছে এবং তোমার সাথে যা ঘটতে যাচ্ছে, তার প্রতি ধৈর্য ধরো। এটি তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলবে। জেনে রাখো, আল্লাহর ভয় দুটি জিনিসের মধ্যে নিহিত। একটি হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা এবং অন্যটি তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করা। তাঁর আনুগত্য অর্জিত হয় এই দুনিয়াকে ঘৃণা করা এবং পরকালকে ভালোবাসার মাধ্যমে। তাঁর অবাধ্যতা অর্জিত হয় এই দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং পরকালকে ঘৃণা করার মাধ্যমে। অন্তরের কিছু হাকীকত রয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছেন। এর কিছু আছে গোপন এবং কিছু আছে প্রকাশ্য। প্রকাশ্য হাকীকত হলো, সত্যের ক্ষেত্রে অন্তরের কাছে তার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী সমান হবে। আর অন্তরের গোপন হাকীকতটি জানা যাবে তা তার থেকে জিহ্বায় প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার মাধ্যমে এবং তার প্রতি মানুষের ভালোবাসার মাধ্যমে। অতএব মানুষের ভালোবাসা পেতে বিমুখ হয়ো না। কারণ নবীগণ নিজেরাই তাদের ভালোবাসা চেয়েছিলেন। যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাকে মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি তাকে মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র করেন। মানুষের কাছে তোমার মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা যাচাই-বাছাই ও বিবেচনা করো।

এরপর সা'দ ছয় হাজার যোদ্ধা নিয়ে ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন। এর আগে উমার তাকে সেখানকার অধিবাসীদের শাসক ও পারস্য অভিযানের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। উমার জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালি এবং আল-মুসান্না ইবনে হারিসা আশ-শায়বানিকে সা'দের কর্তৃত্ব মেনে নিতে ও তাঁর আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন। সেনাপতিত্ব নিয়ে তাদের মধ্যে আগে থেকেই মতবিরোধ চলছিল; মুসান্না জারিরকে বলেছিলেন, আমিরুল মুমিনীন আমার জন্য তোমাকে অতিরিক্ত সৈন্য হিসেবে পাঠিয়েছেন। জারির উত্তর দিয়ে বললেন, তিনি আমাকে তোমার সেনাপতি হিসেবে পাঠিয়েছেন। সা'দ পৌঁছানোর পর তাদের মতবিরোধের অবসান ঘটলো। সেই বছরই মুসান্না মৃত্যুবরণ করেন এবং সা'দ তাঁর জন্য আল্লাহর রহমতের দুআ করেন ও তাঁর বিধবা স্ত্রী সালমাকে বিয়ে করেন। সা'দ যখন ইরাকের সেনা ছাউনিতে পৌঁছান, তখন সেটির নের্তৃত্ব তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হলো এবং ইরাকের সমস্ত আমীরকে তাঁর অধীন করে দেয়া হলো এবং সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব ছাড়া আর কোনো সেনাপতির কতৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। উমর তাঁর কাছে আরও অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতে থাকেন, যার ফলে কাদিসিয়্যায় তাঁর সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে পৌঁছায় অথবা অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে, ছত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। (চলবে ইনশা-আল্লাহ)

ইসলামী দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. রেজাউল করিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(পর্ব-১)

ইসলামী দাওয়াহ হচ্ছে মানুষের কাছে ইসলাম ধর্ম পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আকীদা, শরীয়াহ, আচার- আচরণ, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি। দাওয়াহ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বান করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যেমন নির্দেশ করেছেন, তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা।[১৭] তেমনি প্রিয় নবী ﷺ এ দাওয়াতি কাজে উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন : "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি আয়াত হয়। পবিত্র কুরআন হলো দাওয়াত, রহমত ও সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়াতের গ্রন্থ। এখান থেকেই জ্ঞানের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয় এবং দাঈ ও সংস্কারকরা এর নির্মল উৎস থেকে উপকৃত হন। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া মানবজাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়; এটি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) এই দাওয়াতের মাধমে মানুষের কাছে সত্যকে স্পষ্ট করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন। আর উম্মাতের আলেম-উলামাগণের দাওয়াত মানুষদের কাছে দ্বীনের নিদর্শন ও সৌন্দর্য তুলে ধরেছে। মানুষ সর্বদা দাওয়াতের মুখাপেক্ষী ছিল এবং আছে, বিশেষ করে আমাদের এই যুগে–যেখানে ফিতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ নিজেরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে–সেখানে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্র। আল্লাহর দিকে দাওয়াত সর্বজনীন; কারণ এটি ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত, আর ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের নামে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এমন এক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত, যা সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া ও পাওয়া– আর তা হলো শান্তি। শান্তিই আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রধান লক্ষ্য এবং একই সঙ্গে এটি মানবজাতির সর্বোচ্চ লক্ষ্যও বটে। পূর্ববর্তী জাতিগুলোর দাওয়াত ছিল; নির্দিষ্ট জাতির জন্য, তবে তাওহীদের দাওয়াতে কোনো পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল কেবল শরীয়তের বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামে।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া সহজ কাজ নয়। অনেক নবীকেই তাদের জাতি হত্যা করেছে, কারণ তারা বলেছিলেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। হে আমার জাতি! তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারেন, যাকে আল্লাহ তাওফীক দান করেছেন এবং যার মধ্যে এমন গুণাবলি রয়েছে যা তাকে এই মহান দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত করে তোলে। একজন দাঈ ইলাল্লাহর জন্য কিছু মৌলিক গুণাবলি অপরিহার্য। গভীর ঈমান, একনিষ্ঠতা, বিনয়, ধৈর্য, আল্লাহর ওপর ভরসা, দয়া ও সহানুভূতি এবং উত্তম চরিত্র। এসব গুণ দাওয়াতের সফলতার মূলভিত্তি। এসব গুণ অর্জনের মাধ্যমে একজন দাঈ মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে পারেন। তাই প্রত্যেক দাঈর উচিত নিজের চরিত্র ও আমলকে পরিশুদ্ধ করে এসব গুণে নিজেকে গড়ে তোলা, যাতে দাওয়াতের কাজ ফলপ্রসূ হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দাওয়াতি কাজ কেবল করলেই হয় না, বরং তা কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতিতে করতে হয়। আর দাওয়াতি ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি, উপায়-করণ অনুসরণ করা যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে, হিকমাহ, উত্তম উপদেশ বা মিষ্টি কথা যা মানুষের কঠোর হৃদয়কে নরম করে, তর্ক-বিতক: আশা ও ভয় দেখানো যা আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। কখনো কখনো উপমা প্রদান এবং কুরআন ও সুন্নাহর সত্য ঘটনা বর্ণনা করা। মসজিদে মরুচাবীর প্রস্রাব: নবীজি ﷺ তাকে গালি না দিয়ে বরং মমতা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, মসজিদ ইবাদতের জায়গা।

পরিশেষে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানহাজ অনুসরণ করা জরুরি, যে মানহাজ কোনো ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি তথা মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয় নয়; এটি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি জ্ঞানসম্মত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ

❖ প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলোজী বাংলাদেশ।

[১৭] সূরা আন-নাহল আয়াত : ১২৫।

মানহাজ। আর সেই মানহাজ হচ্ছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে আগে ঈমানের দিকে দাওয়াত প্রদান, তারপর ইবাদত। দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈর ভূমিকা একজন শিক্ষক, বিচারক নন, একজন দাঈ বা দাওয়াত প্রদানকারীর মূল কাজ হলো 'তাবলিগ' (পৌঁছে দেওয়া) এবং 'তালীম' (শিক্ষা দেওয়া) বিচার করা বা শাস্তি ঘোষণা নয়। কঠোরতা বনাম কোমলতা নবীজি ﷺ-মসজিদে প্রস্রাবকারী মরুবাসীকে গালি না দিয়ে বরং মমতা দিয়ে বুঝিয়েছিলেন যে, মসজিদ ইবাদতের জায়গা।

دعوة এর সংজ্ঞা :

শাব্দিক অর্থে دعوة এর অর্থ হচ্ছে ডাকা, আহব্বান করা, চাওয়া, ইবাদত তাওহীদ ইত্যাদি।

পরিভাষায় : ইহলৌকিক কল্যাণ পরকালীন মুক্তির জন্য মানুষকে ভালো কাজের উৎসাহ প্রদান, খারাপ ও গুনাহর কাজ হতে নিষেধ করা।[১৮]

কেউ বলেন : মানুষদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান আদেশ-নিষেধের দিকে ডাকা তথা আহবান করা।[১৯]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন: ইসলামী দাওয়াহ হচ্ছে, মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নবী রাসূলগণ যে শরীআত, বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আহব্বান করা এবং তাঁরা যে সকল খবর, সংবাদ আমাদেরকে প্রদান করেছেন সেগুলো বিশ্বাস করা ও তাঁরা যে কাজের নির্দেশ করেছেন সেগুলো মানা।[২০]

ইসলামী দাওয়াহ প্রদানের হুকুম حكم الدعوة :

দাওয়াহর হুকুমের ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত যে, দাওয়াত প্রদান করা তথা আহব্বান করা প্রত্যেক সামর্থবান ধর্মীয় বিষয়ে যোগ্য পুরুষ-নারী সকলের ওপর ওয়াজিব। কিন্তু যে ব্যাপারে মত-পার্থক্য করেছেন তাহলো, সকলের জন্য কি ফরযে আইন?

দাওয়াত প্রদানের হুকুম সম্পর্কে যদি আলেম-উলামার মাঝে ইখতেলাফ পাওয়া যায় অর্থাৎ দুটি মত পাওয়া যায় :

১ম মত : দাওয়াত প্রদান করা ফরযে আইন। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা হতে প্রমাণ পেশ করেছেন।

❖ **কুরআন হতে প্রমাণ :** আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি সব কিছুই পৌঁছে দাও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে না; আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না।"[২১]

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"তুমি বল ঃ এটাই আমার পথ; প্রতিটি মানুষকে আমি আহব্বান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও; আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[২২]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।"[২৩]

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"হে বৎস! সালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।"[২৪]

ওপরে উল্লেখিত আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী দাওয়াহ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করা সবার জন্য ফরয। কেননা

[১৮] হিদায়াতুল মুরশেদীন : ১৭।
[১৯] উসূলুদ দাওয়াহ : ৫।
[২০] মাজমু ফাতায়াহ : ৫১১৫।
[২১] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ৬৭।
[২২] সূরা ইউসুফ আয়াত : ১০৮।
[২৩] সূলা আন-নাহল আয়তা : ১২৫।
[২৪] সূরা লুকমান আয়াত : ১৭।

আল্লাহ এ সকল আয়াত নবী ﷺ-কে নির্দেশ করেছেন। আর ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী নবীকে কোনো নির্দেশ করলে সেটা সবার জন্য সবার ওপর প্রযোজ্য, যতক্ষণ না কোনো দলীল দ্বারা নবী ﷺ-কে নির্দিষ্ট করা হয়।

সুন্নাহ হতে প্রমাণ :

১। প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছে করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নিল।"[২৫]

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত হাদীসে بَلِّغُوْا শব্দটি নির্দেশবাচক, আর আরবীতে أمر বা নির্দেশবাচক ক্রিয়া দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়।

২। নবী ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন,

أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ

"শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়।"[২৬]

৩। অপর হাদীসে নবী ﷺ বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা, আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর।"[২৭]

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে أمر তথা নির্দেশমূলক শব্দ এসেছে। যেমন – بَلِّغُوْا

[২৫] সহীহ বুখারী হা : ৩৪৬১।
[২৬] সহীহ বুখারী হা : ১০৫।
[২৭] সহীহ মুসলিম ইঃ ফাঃ হা : ৮৩।

এ শব্দগুলো ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়, যতক্ষণ না কোনো প্রমাণ/ইশারা এটাকে অন্য অর্থে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায়।

২য় মত : কেউ কেউ বলেন, ইসলামী দাওয়াতের কাজ করা ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ কেউ কেউ করলে হয়ে যাবে, সকলের ওপর ফরয না। এ মতের ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেছেন।

কুরআন হতে প্রমাণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।"[২৮]

এখানে مِّنْكُمْ শব্দটি কিছু সংখ্যক লোকের জন্য ব্যবহার হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

" এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।"[২৯]

দাওয়াতি কাজের জন্য হাদীসের জ্ঞান প্রয়োজন। এ জ্ঞান সবার মাঝে পাওয়া যায় না।

সুন্নাহ হতে প্রমাণ :

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইসলামী দাওয়াহ সকলের ওপর ওয়াজিব, কিন্তু এর হুকুম হচ্ছে ফরযে কেফায়া। এটা কিন্তু যোগ্য নির্দিষ্ট লোকের ওপর ফরয। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[২৮] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৪।
[২৯] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১২২।

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(১০ পর্ব)

ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআনবাদ :

ভারতীয় উপমহাদেশ বলতে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে বুঝানো হয়। আমরা ইতঃপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের কুরআনবাদ নিয়ে আলোকপাত করেছি। এখন আমরা ভারতীয় উপমহাদেশ তথা ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কুরআনবাদ নিয়ে আলোচনা করার অপরিহার্যতা অনুভব করছি। ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক কুরআনবাদের সূচনা হয়েছে মূলত ব্রিটিশদের হাত ধরে। এটা মুসলিমদেরকে ইসলামী আদর্শ থেকে বিচ্যুত করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র। আমরা যারা ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু আধটু পড়াশোনা করি তারা জানি যে, ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নাম দিয়ে ইংরেজরা ৩১শে ডিসেম্বর ১৬০০ইং সালে প্রথম ভারত উপমহাদেশে আগমন করে। ১৬১২ সালে তারা বাদশা জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে সনদ লাভ করে ব্যবসায়ীক কার্যক্রম শুরু করে এবং ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই পরবর্তীতে খ্রিষ্টান মিশনারীরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ১৬৫৯ সালে সম্ভাব্য সকল উপায়ে যিশুর বাণী প্রচার করার আগ্রহ পকাশ করে। এই মিশনারীরা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকে, এমনকি ১৮১৫ সালের মধ্যেই তারা কোলকাতার আশপাশেই ২০২টি মিশনারী স্কুল স্থাপন করে। ১৮১৮ সালে উইলিয়াম ক্যারির সভাপতিত্বে শ্রীরামপুর (হুগলী) কলেজ স্থাপিত হয়।[৩০]

ইংরেজরা খুব ভালভাবেই লক্ষ্য করলো যে, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াত করে। এ থেকে তারা অনুভব করলো যে, মুসলিমরা ধর্মপরায়ণ হলেও তারা ধর্ম বুঝে না এবং তারা ইংরেজীও বুঝে না। এই সুযোগে ইংরেজরা ধর্মপরায়ণ ও আবেগী মুসলিমদেরকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করবার জন্য দুটি কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে।

এক. ইসলাম বিকৃতির নীল নকশার বাস্তবায়ন; মুসলিমদের মাঝে ইসলামের নামে নতুন নতুন দলাদলির সৃষ্টি করা, বিদ'আতের প্রচলন করা এবং সুন্নাহ থেকে মুসলিমদের বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। যাতে করে মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র কুরআনের মাঝেই স্বীমাবদ্ধ রেখে শারঈ আমল তথা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করা যায়। তারা যখন দেখলো যে, বাইবেলের ভেতর ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো সমাধান নেই। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কুরআনুল কারীমের মাঝে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনার সকল সূত্রই রয়েছে এবং যার নিখুঁত ব্যাখ্যা নাবী ﷺ-এর জবানীতে এসেছে তখন তারা মুসলিদেরকে নবুয়তী ব্যাখ্যামুক্ত করতে কুরআনিক মুসলিম তৈরী করার নীলনকশা প্রণয়ন করে। যার ফলাফল হলো আধূনিক যামানার কুরআনবাদ।

দুই. যে সকল মুসলিম সন্তানরা তাদের আদর্শ ও সভ্যতা গ্রহণ করবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের বাহ্যিক আমলের বিরুদ্ধে লেখক তৈরী করা। যাতে করে অজ্ঞ মুসলিদেরকে তারা নেতৃত্ব দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারে। এজন্য ইংরেজীতে দক্ষ কতিপয় ব্যক্তিকে তারা মনোনীত করে এবং তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার কাজে নিয়োজিত করে এবং মুসলিমদের মাঝে তাদের নাম প্রসারিত করে এবং তাদেরকে মুসলিম নেতা বলে পরিচিত করে তোলে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- আহমাদ খান (যিনি স্যার সৈয়দ আহমাদ খান নামে বেশি পরিচিত), মৌলভী চেরাগ আলী ও আব্দুল্লাহ যাকের আলভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৩০] বাঙ্গালী মুসলিমস এন্ড ইংলিশ অ্যাডুকেশন ৩০পৃ, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস : ১৫২-১৬০পৃ.।

আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ কয়েকজন কুরআনবাদী নেতার নাম ও পরিচয় উল্লেখ করছি।

আহমাদ খাঁন :

আহমাদ খাঁন যিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন নামে পরিচিত। তিনি ১৮১৭ সালে দিল্লিতে জন্মলাভ করেন। তিনি নাহু, সরফ ও মানতিক শাস্ত্রে বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরেজদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন বিধায় তিনি ইংরেজ শাসনামলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি বাইবেলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করে তার নাম দেন তিবইয়ানুল কালাম। তিনি ইসলাম ধর্মের মধ্যে সংস্কার আনয়নের নামে সুন্নাহ বা হাদীসের সত্যতা অস্বীকার করেন এবং তার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

আহমাদ খাঁনের ধর্মীয় বিশ্বাস :

১. তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও সিয়ামের আবশ্যকতা বিশ্বাস করতেন না।

২. তার মতে ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসের নাম, কোনো ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস থাকলেই সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তার শারঈ কোনো আমলের আবশ্যকতা নেই।

৩. তার মতে ফেরেশতা ও শয়তান নামে কোনো সত্তার কিংবা শরীরিক অস্তিত্ব নেই বরং মানবীয় শক্তিকে ফেরেশতা ও পশু শক্তিকে শয়তান বলা হয়!!।

৪. সকল ধর্মবিশ্বাসকে একীভূত করতে তিনি বিভিন্ন ধরনের লিখনী ও প্রবন্ধ রচনা করতেন।

৫. তার মতে নাবীদের মু'জিযা নবুওয়াতের দলীল নয়।

৬. ইজমাউল উম্মাহ শরীয়তের জন্য কোনো দলীল নয়।

৭. সুন্নাহ বা হাদীস ইসলামের কোনো বিষয়ের জন্য দলীল সাব্যস্ত হবে না। [৩১]

৮. তার মতে কুরআনের তাফসীর করতে হবে আকল বা বিবেক দ্বারা, প্রচলিত সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা যাবে না।

৯. তার দাবি হলো জান্নাত জাহান্নাম ও আখিরাত বলতে কিছুই নেই।

১০. তার দাবি হলো " أن القرآن نزل على الرسول بالمعنى فقط নাবী ﷺ-এর ওপর কুরআনের অর্থ নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তার মতে শুধু অর্থের নাম কুরআন বিধায় যেকোনো ভাষায় কুরআন পাঠের মাধ্যমে সালাত আদায় করা যাবে।[৩২]

মৌলভী চেরাগ আলী :

মৌলভী চেরাগ আলী ভারতীয় উপমহাদেশের একজন কুরআনবাদী নেতা। তিনি ১৮৪৪ইং সালে জন্মলাভ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি আহমাদ খাঁনের অনুসারী ছিলেন।

তার মতে, ইসলামে নারীদের পর্দা করার আবশ্যকীয় কোনো বিধান নেই এবং যাকাত প্রদানের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই।

অন্যান্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস আহমদ খাঁনের মতোই।

মৌলভী আব্দুল্লাহ যাকের আলভী :

মৌলভী আব্দুল্লাহ যাকের আলভী পাকিস্তানের লাহোরে জন্মলাভ করেন। আহমাদ খাঁনের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং আহমাদ খাঁনের অসমাপ্ত কাজের তিনি পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি কুরআনবাদের একজন লেখক ছিলেন। প্রায় ১৪টির মতো বিভ্রান্তিকর বই লিখেছেন। তার মতে, কুরআনই একমাত্র ওহী, কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ওহী নয়। যাকের আলভী কবি ইকবালের কবিতায় প্রভাবিত ছিলেন এবং কাদিয়ানী বিশ্বাসের প্রতিও তার আকর্ষণ ছিলো। ১৯৩৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খাজা আহমাদুদ্দীন অমৃতসরী :

খাজা আহমাদুদ্দীন অমৃতসরী ১৮৬১ইং সালে ভারতের অমৃতসরে জন্মলাভ করেন। অমৃতসরেই তিনি

[৩১] আল কুরআনিয়্যুনাল আরাব : ৭২-৭৩পৃ.

[৩২] আল কুরআনিয়্যুনা ওয়া শুবহাতুহুম বিস সুন্নাহ : ১০৫পৃ. ।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি আহমাদ খাঁনেরই অনুসারী ছিলেন। তার মতে, নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর তার অনুসরণ করা বৈধ নয়। নাবীর আনুগত্য করা তার জীবিত থাকার সাথে নির্ধারিত। তার মৃত্যুর পর তার আনুগত্য করা বৈধ নয়!!। ১৯৩৬ ইং সালে আহমাদুদ্দীন অমৃতসরী মৃত্যুবরণ করেন।

হাফেজ আসলাম ভূপালী :

মুহাম্মাদ আসলাম ভূপালী বিন আল্লামা সালামাতুল্লাহ ভূপালী ছিলেন একজন সুফী ইতিহাসবীদ যিনি আধুনিক কুরআনবাদ বা হাদীস অস্বীকারকারীদের এক মজবুত ভিত্তি। *(ইনকারু হাদীস কি নাতাইজ : ৫৭পৃ.)*

মুহাম্মাদ আসলাম ১৮৮০ইং সালে উত্তর প্রদেশের জরাজপুরের একটি আহলে হাদীস পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয করেন, এজন্য তার নামের সাথে হাফেজ উপাধি যুক্ত করা হয়। এরপর তিনি ফারসী ও ইংরেজী ভাষার ওপর পড়াশোনা করেন। এরপর মাওলানা ফাতহুল্লাহর কাছে তিনি আরবী ভাষার ওপর তালীম নেন। তিনি একাডেমিক কোনো মাদরাসা কিংবা স্কুলে পড়াশোনা করেননি বরং ব্যক্তিগত পড়াশোনা করেই তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। ১৯০৩ সালে তিনি দৈনিক লাহোর পত্রিকার একজন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ধর্মীয় বিষয়ে তিনি আহমাদুদ্দীন অমৃতসরীর চিন্তা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তার লিখিত কিতাবের অনুবাদ করে প্রচারও করেন। তিনি হাদীস অস্বীকার সংক্রান্ত অনেক বই লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধও লিখতেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং ১৯৫০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

গোলাম আহমাদ পারভেয :

গোলাম আহমাদ পারভেয; যিনি গোলাম আহমাদ পারভেয বিন ফাযলে দ্বীন বিন রহীম বখ্শ্। তিনি ১৯০৩ইং সালে পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা গ্রামে জন্ম লাভ করেন। ১৯২৭ সালে পারভেয ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে পকিস্তানের জাতীয় কবি মুহাম্মাদ ইকবাল তাকে কায়েদে আজম জিন্নাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে কায়েদে আজম জিন্নাহ তাকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেন। ১৯৫৫ সালে তিনি সহকারী সচিব পদ থেকে অবসরে চলে গেলে কায়েদে আজম জিন্নাহ ১৯৫৬ সালে তুলূ- এ ইসলাম পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কুরআনবাদী মতবাদে তিনি হাফেজ আসলামের ছাত্র ছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের কুরআনবাদী ফেতনার বিস্তারে তার অবদান অনেক বেশি। তিনি প্রায় ৩৩টির মতো বিভ্রান্তিকর বই লিখেছেন।[৩৩]

উল্লেখ্য যে, কায়েদে আজম জিন্নাহ মূলত জন্মগত শীয়া মতবাদের অনুসারী হলেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুসলিম ছিলেন। গোলাম আহমাদ পারভেযের মতো হাদীস অস্বীকারকারী নেতা যার ধর্ম উপদেষ্টা তিনি যে হাদীসের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন না তা স্পষ্টই বলা যায়। কবি মুহাম্মাদ ইকবালও তার ব্যতিক্রম নন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের কোনো কোনো আলেম বা বক্তা তার নামের সাথে আল্লামা যোগ করে থাকেন, এমনকি কুরআন হাদীস ছেড়ে শুধু মুহাম্মাদ ইকবালের কবিতা দিয়েই সারা বছর ওয়াজের জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করুন।

গোলাম আহমাদ পারভেয- এর মারাত্মক বিভ্রান্তি :

১. নিশ্চয় নাবী ﷺ ও তাঁর অনুসারীগণ কুরআন থেকে যে মাসআলা নির্ণয় করেছেন তা শরীয়ত ছিলো তাদের যামানায়। এর পরর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হবে তাই শরীয়ত হিসাবে বিবেচিত। বর্তমান যামানার মুসলিমরা রাসূল ﷺ এর যামানার সাহবীদের শরীয়তের প্রতি দায়বদ্ধ নয়।

[৩৩] শুবহাতুল কুরআনিয়্যিনা :৩পৃ, আল কুরআনিয়্যুউনা ওয়া শাবহাতুহুম হাওলাস সুন্নাহ ;৪৮-৫০পৃ.।

২. ইসলামের যাকাত ব্যাবস্থা, ওয়ারিস বন্টন নীতিসহ আর্থিক বিধিবিধান যতো আছে তার সবই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এ বিধানগুলো নাবী ﷺ এর যামানা পর্যন্ত সীমাদ্ধ, তার পরবর্তী যামানায় এ বিধানগুলোর কোনো আবশ্যকতা নেই।

৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে উলিল আমরদের অনুসরণ করো।[৩৪]

পারভেযের মতে এখানে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য বলতে রাষ্ট্রের অনুসরণ করা বুঝানো হয়েছে।

৪. নাবী মুহাম্মাদ ﷺ নিজে তাঁর অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করার অধিকার রাখেন না! কাজেই তাঁর আনুগত্য করা কোনো মুসলিমের ওপর আবশ্যক নয়।

৫. জান্নাত ও জাহান্নাম বলতে নির্দিষ্ট কোনো স্থান বুঝায় না বরং তা মানুষের কর্মকৌশল!!

৬. ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস-এটা অগ্নিপূজকদের বিশ্বাস, এটাকে মুসলিমদের মাঝে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে!![৩৫]

সুতরাং একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, গোলাম পারভেয আল্লাহ ও তার রাসলের প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাস করতো না। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম, হাশর, হিসাব নিকাশ এবং ভাগ্যের প্রতিও তার কোনো বিশ্বাস ছিলো না। আর সে জন্যই ভারত, পাকিস্তান, সিরিয়া মিসর ও হিজাজের প্রায় হাজারেরও বেশি আলেম তাকে কাফের ও মুরতাদ বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন।[৩৬]

এখানে কুরআনবাদের যাদের নাম উল্লেখ করা হলো তারা ব্যতীত আরো অনেক মুনকিরুল হাদীস রয়েছে যারা ভারতীয় উপমহাদেশে এ মতবাদ প্রচার ও প্রসারের কজে নিয়োজিত ছিলো এবং এখনও আছে। আমরা এখানে বৈশ্বিকভাবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি মাত্র। বাংলাদেশের কুরআনবাদদের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ, বাংলাদেশের হাদীস অস্বীকারকারীদের নিজস্ব কোনো মানহাজ কিংবা আদর্শ বলতে কিছুই নেই। এরা সবসময় ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের কুরআনবাদের দিকেই সিজদায় লুটিয়ে থাকে। এদের নিজস্ব কোনো বুদ্ধি-বিবেক বলতে কিছুই নেই, অনেকটাই পুতুলের নাচের মতো; যেভাবে নাচতে বলে এরা সেভাবেই নাচে। চলবে, ইনশাআল্লাহ

[৩৪] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৫৯।
[৩৫] মাজমউল ফাতওয়া বিন বায রহ : ৩/২৬৭-২৭১পৃ.।
[৩৬] আল কুরআনিয়্যুনা ওয়া শাবুহাতুহুম হাওলাস সুন্নাহ : ৫৪পৃ.।

তীব্র গরমে সুস্থ থাকার উপায়

ডা. আবেদ হোসেন বলেন, তীব্র গরমে বিশেষত শিশু ও কিশোর, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষ এবং খেটে খাওয়া শ্রমিক ও মজুরদের কষ্ট ও ঝুঁকি বেশি। কর্মজীবী, শিক্ষার্থীসহ যাদের বাইরে যেতে হয় এবং যারা ঘরে থাকেন তাদের কিছু সতর্কতা মেনে চলা উচিত। যেমন-

১. বাইরে বের হওয়ার সময় ছাতা বা ক্যাপ ব্যবহার করতে হবে।

২. শরীরে পানিশূন্যতা এড়াতে অতিরিক্ত পানি ও শরবত পান করতে হবে এবং বাইরে বের হওয়ার সময় পানি, শরবত বা স্যালাইনের বোতল বহন করতে হবে।

৩. সরাসরি রোদ এড়িয়ে ছায়াযুক্ত স্থান দিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে।

৪. ভারি ও কালো কাপড় বাদ দিয়ে হালকা রং ও পাতলা কাপড় পরতে হবে।

৫. ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সানস্ক্রিন এবং প্রয়োজনে সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে।

৬. খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়া যাবে না। বিশেষত যারা হৃদরোগ, লিভার ও কিডনির স্থায়ী রোগে ভুগছেন তাদের।

৭. সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত সময় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে বাইরের কাজ কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৮. একটানা কেউ রোদে কাজ করবেন না। কাজের মধ্যে কিছু সময় পরপর ছায়াযুক্ত জায়গায় বিশ্রাম নিতে হবে। *(দ্য ডেইলি স্টার)*

নির্মল হৃদয়

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ❖

আজকের সময়ে যখন মুসলিমদের ওপর ফিতনা-ফাসাদের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে, তখন আমাদের ওপর কতই না প্রয়োজন যে, আমরা একে অপরকে সৎ উপদেশ দিই এবং পরস্পরের হাত ধরে রাখি। হতাশার বিষয় হল, বর্তমান যুগে মুসলিমদের মাঝে পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণার প্রবণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই আমাদের ভাইদের জন্য উচিত নির্মল ও প্রশান্ত হৃদয়ের বাস্তবতা স্মরণ করে নিজেদেরকে শুধরিয়ে নেওয়া, যার কথা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বারংবার উল্লেখ করেছেন।

তাহলে কলবে সালীম কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ – اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না। তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে।'[৩৭]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, কলবে সালীম বা নির্মল হৃদয় হলো সেই হৃদয়, যা শির্ক, বিদ্বেষ, হিংসা, কৃপণতা, অহংকার, দুনিয়ার মোহ ও নেতৃত্বের লালসা থেকে মুক্ত থাকে। ফলে তা এমন প্রতিটি বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আবার তা এমন প্রতিটি সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকে, যা আল্লাহর বাণীর বিরোধিতা করে এবং এমন প্রবৃত্তি থেকেও মুক্ত থাকে, যা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে। এমন প্রতিটি ইচ্ছা থেকেও মুক্ত থাকে, যা আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে এবং এমন প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা থেকেও নিরাপদ থাকে, যা বান্দাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর পাঁচটি বিষয় থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বান্দার অন্তরের পূর্ণ নিরাপত্তা অর্জিত হয় না। তা হল, এক. এমন শিরক, যা তাওহীদের বিরোধী। দুই. এমন বিদ'আত, যা সুন্নাহর বিরোধী। তিন. এমন কুপ্রবৃত্তি, যা আল্লাহর আদেশের বিরোধী। চার. এমন গাফলতি, যা আল্লাহর স্মরণের বিপরীত। পাঁচ. এমন প্রবৃত্তির অনুসরণ, যা একনিষ্ঠতা ও ইখলাসের বিরোধী। এই পাঁচটি জিনিসই আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। আর এর প্রত্যেকটির অধীনে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যার সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। এ কারণেই বান্দার জন্য অপরিহার্য হলো, আল্লাহর কাছে সর্বদা 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর হিদায়াত চাওয়া। কারণ, এই দো'আর চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় এবং অধিক উপকারী আর কিছুই বান্দার জন্য নেই।[৩৮]

অন্যত্র ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন, সেই নির্মল হৃদয় আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে, যে তার রবের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে, তাঁর আদেশের অনুগত হয়েছে এবং যার মধ্যে আর আল্লাহর নির্দেশ ও সংবাদ সম্পর্কে কোনো দ্বিধা নেই। সে হৃদয় তো আল্লাহ ও তাঁর আদেশ ব্যতীত সবকিছু থেকে মুক্ত। যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর আদেশের পাবন্দ থাকে। যার একমাত্র লক্ষ্য থাকে আল্লাহর আদেশ মান্য করা এবং শরী'আতই যার এগিয়ে চলার একমাত্র পথ ও পদ্ধতি, তাকে কোনো সন্দেহ আল্লাহর বাণীর সত্যতায় বিশ্বাস করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। বরং কোনো সন্দেহ তার মনে দানা বাঁধলে মুহূর্তেই তা দূর হয়ে যায়, কারণ এ হৃদয়ে তার স্থায়ী আসন নেই। আবার কোনো কুপ্রবৃত্তিও তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। যখন কোনো হৃদয় এমন হয়ে যায়, তখন তা শিরক থেকে নিরাপদ হয়, বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়, বিভ্রান্তি ও বাতিল থেকে দূরে থাকে। এটি এমন একটি হৃদয়, যা লজ্জা, ভয়, আশা ও প্রত্যাশা সবকিছুই তার রবের ইবাদতে নিবেদিত করে। আল্লাহর ভালোবাসা এ অন্তরে এমনভাবে পূর্ণ হয় যে, অন্য সব কিছুর ভালোবাসা মুছে যায়। আল্লাহর ভয় অন্য সব ভয়কে দূর করে দেয়। আল্লাহর প্রতি আশা অন্য সব আশাকে ছাড়িয়ে যায়। আবার সে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের প্রতিও আত্মসমর্পণ করে; তাকদীর বিষয়ে আল্লাহকে অভিযুক্ত

❖ *আরবী প্রভাষক, হানাইল নো'মানিয়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট ও সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস জয়পুরহাট জেলা।*

[৩৭] সূরা আশ-শু'আরা আয়াত : ৮৮-৮৯।

[৩৮] ইবনুল কাইয়্যিম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫১।

করে না, তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধিতা করে না এবং তাকদীরের ব্যাপারে অসন্তুষ্টও হয় না। কাজেই সে তার রবের কাছে বিনয়, আনুগত্য, নম্রতা ও দাসত্বের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে। তার সকল অবস্থা, কথা, কাজ, রুচিবোধ ও অনুভূতির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সবকিছুই রাসূলের প্রদীপ থেকে আলো গ্রহণ করে। সে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বক্তব্য ও মতামতকে রাসূলের আনীত শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। তা সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করে, অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করে। আর কোনো বিষয়ে সামঞ্জস্যতা বা বিরোধিতা স্পষ্টভাবে বুঝে না আসলে, সে ব্যাপারে থেমে থাকে, যতক্ষণ না বিষয়টি পরিষ্কার হয়। আর সে আল্লাহর বন্ধু, সফলকামদের দল এবং দ্বীনের রক্ষক ও সুন্নাহর অনুসারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহর বিরোধীদের শত্রু মনে করে, যারা মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত দিকে আহ্বান করে।[৩৯]

মানুষের সবচেয়ে দামী ও মর্যাদাকর অঙ্গ হল তার কলব বা অন্তর। এটি তার সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের মূল। অন্তরের সংশোধনই পুরো শরীরের সংশোধন এবং অন্তরের ফাসাদ তার পুরো শরীরেই বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর। যেমন নু'মান ইবনু বশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

'জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল অন্তর।[৪০]

কলব বা অন্তর মূলত সকল শক্তির উৎস, রূহের বিশ্রামস্থল এবং ঈমানের সংরক্ষণাগার। অন্তর রবকে পর্যবেক্ষণ ও তাঁকে সন্তুষ্ট করার জায়গা। অন্তর তার মালিকের জন্য স্বস্তির কারণ হতে পারে, যদি তা রবের নিকটে আগমনের দিন সুস্থ থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।'[৪১]

অন্তরের রক্ষণাবেক্ষণ, তার পবিত্রকরণ ও সংশোধন অত্যাবশ্যক এবং আল্লাহর নিকটে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অন্তরের পরিশুদ্ধতার মধ্যেই বান্দার সফলতা, মুক্তি, সৌভাগ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত রয়েছে। অন্তরের সুখ ব্যতীত কি কোনো সুখ হতে পারে? অন্তরের শান্তি ব্যতীত কি কোনো শান্তি হতে পারে?

নিশ্চয় অন্তরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কতগুলো কারণ, মাধ্যম বা স্তর রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ও সর্বোত্তমটি হল, আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠ হওয়া। অর্থাৎ বান্দা তার অন্তরকে রবের প্রতি সম্পৃক্ত করবে। বান্দা তার কথা ও কাজ একমাত্র মহান রবের জন্য নিবেদন করবে, পৃথিবীর কোনো সৃষ্টির জন্য নয়।

আনুগত্যের কাজ অন্তরকে শুদ্ধ রাখে। যেমন শরী'আতের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজসমূহ। আনুগত্যের কাজ অন্তরকে আলোকিত করে, তাকে শক্তিশালী করে এবং সুদৃঢ় রাখে। এর বিপরীতে পাপ ও নাফরমানির কাজ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, পথভ্রষ্ট ও অসুস্থ করে তোলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

'চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায় তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে তাতে একটি উজ্জ্বল দাগ পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। এটি সাদা

[৩৯] ইবনুল কাইয়্যিম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ, পৃ. ৫৪।
[৪০] সহীহ বুখারী, হা : ৫২; সহীহ মুসলিম, হা : ১৫৯৯।
[৪১] সহীহ বুখারী, হা : ২৫৬৪।

পাথরের ন্যায়; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোনো ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো সাদা মিশ্রিত কালো কলসির ন্যায়, তার প্রবৃত্তি যা গ্রহণ করেছে তা ছাড়া ভালো-মন্দ বলতে সে কিছুই চেনে না।'[৪২]

আল্লাহর যিকির অন্তরের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, এর মাধ্যমে রূহ প্রাণবন্ত হয়। এটি এমন আলো যার আলোয় অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহর যিকির অন্তরের খাদ্য এবং শস্যের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.

'জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।'[৪৩] হাদীসের মধ্যে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ করে বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শরী'আতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিকরের দ্বারা সিক্ত থাকে।[৪৪]

আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে সে যেন আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করে; কেননা ইস্তিগফার হলো পাপকে মোচনকারী এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধকারী। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ

'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না।'[৪৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন,

إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

'আমার অন্তরে কখনো কখনো অলসতা দেখা দেয়, তাই আমি দৈনিক একশবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।'[৪৬]

আর যখন বান্দা তেলাওয়াত, আমল ও চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে কুরআনের অভিমুখী হয় তখন তার অন্তর নরম হয়ে যায় এবং কল্যাণ তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখে। আর এমনটা কেনই বা হবে না? অথচ আল্লাহর কিতাব ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। এটি অজ্ঞতার অন্ধকারকে বিতাড়নকারী এবং শরীর ও অন্তরের ব্যধি থেকে আরোগ্য দানকারী এবং সর্বোপরি দ্বীনি ও দুনিয়াবী সকল কাজে হেফাজতকারী। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নাসীহাত আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রহমাত।'[৪৭]

নিশ্চয় বান্দার মর্যাদা তার রবের নিকটে তার অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়; অর্থাৎ বান্দা তার অন্তরের নিষ্ঠার কারণে তার রবের নিকটবর্তী হয় অথবা অন্তরের কঠোরতার জন্য সে তার রব থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

'তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।'[৪৮] রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মল হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর নবীর প্রশংসা করে এরশাদ করেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৪৯]

---

[৪২] সহীহ মুসলিম, হা : ১৪৪।
[৪৩] সূরা আর-রা'দ আয়াত : ৪।
[৪৪] তিরমিযী, হা : ৩৩৭৫; ইবনু মাজাহ, হা : ৩৭৯৩।
[৪৫] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৩৫।
[৪৬] সহীহ মুসলিম হা : ২৭০২।।
[৪৭] সূরা ইউনুস আয়াত : ৫৭।
[৪৮] সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত : ২৫।
[৪৯] সূরা আল-ক্বলম আয়াত : ৪।

একদা সা'দ ইবনু হিশাম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে উদ্দেশ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আখলাক চরিত্র সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত করুন। এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বললাম- হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, আল্লাহর নবী ﷺ-এর আখলাক তো ছিল কুরআন।'[৫০] অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি শিক্ষা, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য, বিনয়, সহমর্মিতা ও নির্মল অন্তর সবকিছুই তাঁর জীবনে বাস্তব রূপ পেয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি শত্রুদের পক্ষ থেকে অবর্ণনীয় নির্যাতন হয়েছে, কিন্তু তিনি প্রতিশোধের পরিবর্তে সর্বদা ক্ষমার নীতি গ্রহণ করেছেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জীবনে কি উহুদ দিবসের চেয়েও অধিকতর কঠিন কোনো দিন এসেছে?" তিনি বললেন, "তোমার সম্প্রদায়ের হাতে আকাবার দিন যে নির্যাতনের শিকার হয়েছি, তা এরচেয়েও অধিকতর কঠিন ছিল। যখন আমি আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে ইবনু আবদে ইয়ালীল ইবনু আবদে কিলালের কাছে নিজেকে পেশ করছিলাম। কিন্তু সে আমার কাঙ্ক্ষিত ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং কারনুস সা'আলিব নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সম্বিৎ ফিরে পাইনি। তারপর যখন আমি মাথা উঠালাম তখন দেখি, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়াপাত করছে এবং এর মধ্যে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মহা-মহিমান্বিত আল্লাহ আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের উত্তরও শুনেছেন এবং তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের ব্যাপারে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আদেশ তাকে করেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন।" তারপর বললেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের উক্তি আল্লাহ তা'আলা শুনেছেন আর আমি হলাম পাহাড়ের (তত্ত্বাবধানকারী) ফেরেশতা। আপনার রব আপনার কাছে আমাকে এজন্যে পাঠিয়েছেন যেন আপনি আপনার ইচ্ছামতো আমাকে নির্দেশ দেন। (আপনি বললে) আমি এ পাহাড় দু'টিকে তাদের ওপর চাপা দিয়ে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি বরং আশা করছি যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এদের ঔরস থেকেই এমন ব্যক্তি বের করে আনবেন, যারা তার সঙ্গে কিছুকে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদাত করবে।[৫১] এই অল্প কয়েকটি শব্দের মধ্যে ইহসানের চারটি স্তর একত্রিত হয়েছে। ১. তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন। ২. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ৩. তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের পক্ষে ওজর পেশ করেছেন। ৪. মমতা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমার কওম।" একটু ভাবুন! কত নির্মল ছিল তাঁর হৃদয়! তিনি নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, ব্যক্তিগত কারণে কাউকে ঘৃণাও করেননি। তাঁর সমস্ত বিষয় ছিল কেবল আল্লাহর জন্য। তিনি রক্তাক্ত অবস্থাতেও শত্রুদের জন্য দো'আ করেছেন।

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী ﷺ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবী (আলাইহিস সালাম)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তারক্তি করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।[৫২]

একবার সেসকল নবীদের অবস্থার কথা চিন্তা করে দেখুন তো! তাদের কওম তাদেরকে আঘাত করে রক্তাক্ত করেছে, অথচ তারা রক্ত মুছতে মুছতে বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করুন; তারা অবুঝ, কিছু জানে না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্মল চরিত্রের বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত বর্ণনায়। আবূ আব্দিল্লাহ আল-জাদালী (রহিমাহুল্লাহ আলাইহি) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র-মাধুর্য সম্বন্ধে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন,

لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَلاَ صَخَّابًا فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল ব্যবহারও করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেননি। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন।'[৫৩] [চলবে ইনশাআল্লাহ...]

[৫০] সহীহ মুসলিম, হা :- ৭৪৬।

[৫১] সহীহ বুখারী, হা :- ৩২৩১; সহীহ মুসলিম, হা :- ১৭৯৫।

[৫২] সহীহ বুখারী, হা :- ৩৪৭৭; সহীহ মুসলিম, হা :- ১৭৯২।

[৫৩] সুনান আত-তিরমিযী, হা :- ২০১৬; আলবানী সহীহ বলেছেন।

তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

আব্দুর রউফ ❖

(১ম পর্ব)

ভূমিকা :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين

তাফসীরশাস্ত্রে ইসরাঈলিয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন বাতিল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার কারণে কুরআনের তাফসীরে বহু সময় উদ্ভট কাহিনী, কাল্পনিক ঘটনা এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বিবরণ প্রবেশ করেছে। এর ফলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে নানা ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কল্পকাহিনীনির্ভরতা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

মূলত এসব বর্ণনার একটি বড় অংশ ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সূত্রের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কিছু বর্ণনা সরাসরি তাওরাত, ইনজিল কিংবা তালমুদ থেকে গৃহীত হয়েছে; আবার কিছু এসেছে তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, লোককথা ও বংশপরম্পরায় প্রচলিত বিবরণ থেকে। পরবর্তীতে এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত তাফসীর গ্রন্থসমূহে অনুপ্রবেশ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য দলীল ছাড়াই উদ্ধৃত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

"মিথ্যা এর সামনে থেকেও আসতে পারে না এবং পেছন থেকেও আসতে পারে না; এটি প্রজ্ঞাময়, সর্বপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"[৫৪]

❖ পিএইচ.ডি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।, সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা। সাবেক শুব্বান সভাপতি, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

১. ইসরাঈলী বর্ণনা পরিচিতি ও বিধান :

আভিধানিক অর্থ : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর অপর নাম ছিল (ইসরাঈল) إِسْرَائِيْل [৫৫] এখানে إِسْرَا অর্থ বান্দা আর ئِيْل অর্থ আল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা।[৫৬] إِسْرَائِيْلِيَّاتٌ বহুবচন। একবচনে إِسْرَائِيْلِيَّة ব্যবহৃত হয় যার অর্থ- ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বা ইহুদি ও খ্রিষ্টান কর্তৃক বর্ণিত বিষয়। إِسْرَائِيْلِيَّاتٌ শব্দটি বানী ইসরাঈলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ কারণে তাঁর বংশধরকে বানী ইসরাঈলও বলা হয়ে থাকে। [৫৭] بني إِسْرَائِيلُ ও إِسْرَائِيلُ পূর্ববর্তী সময়ে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম-এর সময় থেকে মূসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইয়াহুদী হিসেবে খ্যাত ছিল। পরবর্তীতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সময়ে তাদের অধিকাংশ তাঁর প্রতি ঈমান এনে ঈসায়ী তথা নাসারা হিসেবে খ্যাত হয় এবং পরবর্তীতে এদের অনেকেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে মুহম্মাদী হিসেবে খ্যাত হন। আর এই ইয়াহুদী ও ঈসায়ী তথা নাসারাকে একত্রে আহলে কিতাবও বলা হয়।[৫৮]

وقد اشتهرت الروايات التي انتقلت إلى المجتمع الإسلامي عن طريق اليهود والنصارى باسم الإسرائيليات. ولما كان اليهود أكثر شهرةً وعنايةً بنقل تلك الأخبار، غلب إطلاق هذا الاسم عليها، فقيل لها :الإسرائيليات.

ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের থেকে যেসব রেওয়ায়েত মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে, তাই ইসরাঈলী

[৫৪] সূরা ফুসসিলাত আয়াত : ৪২,

[৫৫] https://www. almaany.com

إسرائيل : (اسم) لقب أُطلق على يعقوب بن إسحاق عليهما السلام وإسرائيليّات: الأخبار المنقولة عن اليهود في كتب التَّفسير والتَّاريخ وغيرهما

[৫৬] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-ক্বামূসুল ওয়াজীয* (রিয়াদ প্রকাশনী, ৪র্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮), পৃ. ৭০।

[৫৭] আবূ শাহবাহ, মুহাম্মাদ *আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩।

[৫৮] আবূ শাহবাহ, *আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূআত*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড), পৃ. ১২।

وقد عرفوا "باليهود" أو بـ "يهود" من قديم الزمان ، أما من آمنوا بعيسى : فقد أصبحوا يطلق عليهم اسم "النصاري" وأما من آمن بخاتم الأنبياء : فقد أصبح في عداد المسلمين ، ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب"

রেওয়ায়েত নামে পরিচিত। আর ইয়াহুদীদের খ্যাতি ছিল বেশি এবং তাদের থেকেই বেশি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, এ কারণে একে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বলা হয়ে থাকে। [৫৯]

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ইসরাঈলীয়াত এর পরিচয় প্রদানে ওলামায়ে কিরাম একাধিক মত বর্ণনা করেছেন। যেমন-

هي الأخبارُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل مِنَ الْيَهُودِ وَهُوَ الأَكْثَرُ أَوْ مِنَ النَّصَارَى

অর্থাৎ, অধিকাংশ ইহুদি বনি ইসরাঈল অথবা খ্রিষ্টানদের থেকে বর্ণিত সংবাদকে ইসরাঈলীয়াত বলা হয়।[৬০]

الإِسْرَائِيلِيَّاتُ هو اسم يطلق على الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعَة الْمَنْقُولَة مِنْ كتب التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ

অর্থাৎ, তাওরাত ও ইনজিল থেকে বর্ণিত জাল হাদীসকে ইসরাঈলীয়াত বলা হয়।[৬১]

الإِسْرَائِيلِيَّاتُ هِيَ الْأَخْبَارُ وَالرِّوَايَاتُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ بَنِي إسرائيل

অর্থাৎ, বনি ইসরাঈল থেকে বর্ণিত সংবাদ ও বর্ণনাসমূহকে ইসরাঈলীয়াত বলা হয়। ইসরাঈলীয়াত হলো মুসলিমগণ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে যা বর্ণনা করেছেন।[৬২] তা শুনে শুনে হোক বা সরাসরি কিতাব থেকে। রাসূল ﷺ বলেন- وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ অর্থাৎ, তোমরা বনি ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর। এতে সমস্যা নেই।[৬৩]

তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইসরাঈলী বর্ণনার অনুপ্রবেশ :

তাফসীর গ্রন্থসমূহে ইসরাঈলী বর্ণনার যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে-

১. আরব উপদ্বীপে হিজরতের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন অলৌকিক ও চমকপ্রদ ঘটনা আরব সমাজে মুখে মুখে প্রচলিত হতে থাকে। অপরদিকে মহান গ্রন্থ আল কুরআন অতীত যুগের নবী-রাসূল, বিভিন্ন উম্মত ও জনপদের ঘটনাবলি উপদেশমূলক ও সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু মানুষের স্বভাব হলো কোনো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার প্রতি আগ্রহী হওয়া। এ কারণেই অনেক সময় ইসরাঈলী বর্ণনার নামে বিভিন্ন বিস্তৃত, ভিত্তিহীন ও বাতিল কাহিনি তাফসীরের কিতাবসমূহে প্রবেশ করেছে।[৬৪]

২. ইয়ামান ও সিরিয়ায় আরবদের সফর : আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, আরবরা শীতকালে ইয়ামান এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসায়িক সফর করত। সে সময় সিরিয়া ও আশপাশের অঞ্চলে বহু আহলে কিতাব বসবাস করত, যাদের অধিকাংশই ছিল ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান। স্বাভাবিকভাবেই এসব সফরের মাধ্যমে আরবদের সঙ্গে তাদের পরিচয়, যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান গড়ে ওঠে। এর ফলে আরবরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের নানা ধর্মীয় কাহিনী, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সেসব বর্ণনা আরব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে এসব কথিত ঘটনা ও কাহিনীর একটি অংশ তাফসীরের কিতাবসমূহে "ইসরাঈলী রেওয়ায়েত" নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে তাদের থেকে

---

[৫৯] মুহাম্মাদ হুসাইন আয যাহাবি, আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়া মাওযূআত ফি কুতুবিত তাফসীর, মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কায়রো পৃষ্ঠা : ১৩১৫, দার ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা : ৪৫ পৃষ্ঠা.

[৬০] ইবন উসাইমীন, *কিতাবু উসূলেন ফীত তাফসীর*, পৃ. ৫৩ ; https:// www. shamela.ws

[61] https:// www. marefa.org: ২০ আগষ্ট ২০০৯।

[62] https:// www. Islamweb-net.cdn.ampproject.org: ৩০ অক্টবর, ২০১৩।

[৬৩] *সহীহ আবূ দাউদ*, হা. নং ৩৬২১।

[৬৪] ড. আব্দুল্লাহ খাযের হামাদ, *আল-কিফায়াতু ফিত তাফসীর বিল মাছুর ওয়াদ দিরাইয়া*, (প্রকাশক: দারুল-কালাম, বৈরুত, লেবানন সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৮ হিজরি - ২০১৭ খ্রি.) ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

لقد تناول القرآن الكريم العديد من قصص الأنبياء والأمم السابقة والحوادث التي مرّت في الأزمنة الغابرة بصورة من الإيجاز مع التركيز على جانب الموعظة والعبرة من ذلك القصص دون أن يذكر التفاصيل ودقائق القصة، والنفس البشرية تميل دائماً إلى معرفة التفاصيل ودقائق تتعلق بالقصص القرآني، لذلك عندما سألوا أهل الكتاب فأجابوهم بما هو موجود في التوراة والإنجيل.

শোনা ঘটনা আস্তে আস্তে তাফসীরের কিতাবে চলে আসে।[৬৫]

৩. ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণ :

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইহুদি জাতি ও রাসূল ﷺ-এর মাঝে অনেক বিষয়ে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্ক হতো। তারা নিজেদের মত অনুযায়ী কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিত এবং অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের মূল বক্তব্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করত। এর ফলে অনেক আক্ষরিকভাবে ধর্মগ্রন্থভিত্তিক আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হতো। তবে তাদের মধ্যে কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণও করেছিল। কিন্তু তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কারণে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সবসময় সহজ ছিল না। কারণ, তারা যখন কোনো নবীর ঘটনা বা অতীতের কোনো বিষয় বর্ণনা করত, তখন তা সাধারণত নিজেদের ধর্মগ্রন্থের আলোকে ব্যাখ্যা করত। ফলে তাদের বর্ণনায় কিছুটা ভিন্নতা বা বিকৃতি দেখা যেত। এভাবে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও পরবর্তী যুগে তাফসীরকারগণ তাদের বর্ণিত অনেক কাহিনীকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ বা বর্জন করেছেন।[৬৬]

৪. ইবন খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে তাফসীরে ইসরায়েলি রেওয়ায়েত আসার কারণ :

আল-মুকাদ্দিমা-এ ইবন খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেন যে, তাফসীরের মধ্যে ইসরায়েলি রেওয়ায়েত প্রবেশ করার প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে-

ক. সামাজিক কারণ

আরবদের জীবন ছিল মরুভূমি-নির্ভর ও সীমিত জ্ঞানভিত্তিক। তারা সৃষ্টিজগতের শুরু, বিভিন্ন জাতি ও অতীত ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস জানত না।

তাই এসব বিষয়ে তারা আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) কাছে জিজ্ঞাসা করত। তারা যা বলত, অনেক সময় যাচাই ছাড়াই বিশ্বাস করত এবং সেটাই ধীরে ধীরে তাফসীরের অংশ হয়ে যায়।

খ. ধর্মীয় কারণ

আহলে কিতাবদের কাছ থেকে শোনা অনেক কাহিনী ছিল আশ্চর্যজনক ও ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। এগুলোর অধিকাংশই সরাসরি কুরআনের মৌলিক আকিদা বা শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

ইবন খালদুন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এসব কাহিনী অনেক সময় অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক প্রকৃতির হতো। আরবরা এগুলোর সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করত না, ফলে এগুলো তাফসীর ও বর্ণনার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ফলে দেখা যায়, সামাজিক কৌতূহল এবং ধর্মীয় কাহিনীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস-এই দুই কারণেই ইসরায়েলি রেওয়ায়েতসমূহ তাফসীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।[৬৭]

চলবে ইনশাআল্লাহ

---

[৬৫] *তারীখে তাবারি*, (বৈরুত, লেবানন সংস্করণ:) ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১, *আস সিরাতুন নববিয়্যাহ ওয়া আদ দাওয়াহ ফিল আহদি মক্কা*, পৃ. ২০৮।

[৬৬] ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩ ; মুহাম্মাদ সাঈদ আল আ'তা, *মাফহুমুল ইসরাঈলীয়াত ওয়া আসরুহু ফী তাফসীরিল কুরআন*, (https:// abomhammadin. wordpress.,০৮ ফেব্রুয়ারি,2014) আরবী মূল ইবারত :

والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم. وإنما غلبت عليهم البداوة والأُمِّيَّة، وإذا تشوقوا إلى معرفة مما تتشوق إليه النفوس البَشرية فى أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومَنْ تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من "حِمير" الذين أخوذا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم، وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يُرجع إلى الأحكام فيتُحرَّى فيها الصحة التى يجب بها العمل، وتساهل المفسِّرون فى مثل ذلك، وملأوا الكتب بهذه المنقولات، وأصلها - كما قلنا - عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بَعُد صيتهم، وعظمت أقدارهم، لما كانوا عليه من المقامات فى الدين والمِلَّة، فتلقيت بالقبول من يومئذ...

[৬৭] ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয যাহাবী, *আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩, প্রাগুক্ত।

ঈদুল আযহায় মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয়

আবু মাহদী মামুন আব্দুল্লাহ *

ঈদুল আযহা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। এটি ত্যাগ, কুরবানী ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মহান শিক্ষা বহন করে। এই ঈদ মূলত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের স্মৃতিকে ধারণ করে, যেখানে তাঁরা আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ শিখে যে, আল্লাহর আদেশের সামনে নিজের প্রিয় বস্তু পর্যন্ত ত্যাগ করাই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। ঈদুল আযহা কেবল আনন্দ-উৎসবের দিন নয়; বরং এটি ইবাদত, তাকবীর, সালাত, কুরবানী, দান-সদকা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশের এক মহৎ উপলক্ষ। এই দিনে মুমিন বান্দারা আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার নবায়ন করে। তাই একজন মুমিনের উচিত এই দিনকে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে উদযাপন করা এবং শরীয়তসম্মত আনন্দের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। আজকের প্রবন্ধে ঈদুল আযহায় মুসলিমের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

ঈদুল আযহার করণীয় : ঈদুল আযহা মুসলমানদের জন্য ত্যাগ, ইবাদত ও আনন্দের দিন। এই দিনে কিছু সুন্নাত ও করণীয় রয়েছে, যা পালন করলে সওয়াবের পাশাপাশি ঈদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

১. ঈদের দিন গোসল করা : ঈদের দিনে গোসল করা সুন্নাত। এটি পবিত্রতা অর্জন, সতেজতা বৃদ্ধি এবং ঈদের সালাতের জন্য প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। নাফি‘(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

‘আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদের সালাতের জন্য যাওয়ার আগে গোসল করতেন।’[৬৮]

ফাকিহ ইবনে সাঈদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

‘উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে গোসল করতেন।’[৬৯]

২. শরীয়তসম্মত সাজসজ্জা গ্রহণ করা : ঈদের দিনে পরিষ্কার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী ﷺ-এর কাছে এক খিলাত (সুন্দর পোশাক) আনলেন এবং বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَرِ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ

‘হে আল্লাহর রাসূল! এটি কিনুন এবং ঈদ ও মেহমানদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করুণ।’[৭০]

৩. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা:

ঈদের দিনে সাধ্যমতো উত্তম ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা, যা ইসলামের সৌন্দর্য এবং ঐশ্বরিকতা প্রকাশ করে। নবী ﷺ নিজেও ঈদের দিনে সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন এবং সাহাবাদেরও তা করতে উৎসাহিত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فِي الْعِيدِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ

’নবী কারীম ﷺ ঈদের দিনে এবং জু’মার দিনে তাঁর উত্তম পোশাক পরিধান করতেন।’[৭১]

৪. ঈদের দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা : ঈদের দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত ও একটি সুন্দর আমল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিনে ভালো পোশাক পরিধান করতেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। জাফর ইবন মুহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ طِيبٍ عِنْدَهُ

‘নবী ﷺ ঈদের দিনে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন এবং তার কাছে থাকা সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।’[৭২]

* আক্বীদাহ ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব এবং দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

৬৮ মুয়াত্তা মালিক হা : ৪৮৮।
৬৯ ইবনু আবী শাইবা ২/৪।
৭০ সহীহ বুখারী হা : ৯৪৮।
৭১ মু’জামুল আওসাত লিত-ত্বাবারানী- ৭৭১১; সনদ হাসান।

৫. ঈদের সালাতের আগে কিছু না খাওয়া : ঈদুল আযহার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হলো ঈদের সালাতের আগে কিছু না খাওয়া এবং সালাত শেষে কুরবানীর গোশত দিয়ে আহার শুরু করা। এতে কুরবানীর ইবাদতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণের শিক্ষা প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে :

كان رسولُ اللهِ ﷺ لا يَغْدو يَومَ الفِطْرِ حتى يَأكُلَ، ولا يَأكُلُ يَومَ الأضْحى حتى يَرجِعَ، فيَأكُلَ مِن أُضحِيَّتِه.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে (ঈদের সালাতের জন্য) সকালবেলা বের হতেন না; আর ঈদুল আযহার দিনে তিনি কিছু না খেয়ে (ঈদের সালাত শেষে) ফিরে না আসা পর্যন্ত আহার করতেন না, এরপর তিনি তাঁর কুরবানীর গোশত থেকে আহার করতেন।"[৭৩]

৬. সকাল সকাল যানবাহন ব্যতীত পাঁয়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া : সম্ভব হলে যানবাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে ঈদের সালাতের জন্য ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا

'রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাত আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং ফিরে আসতেন।'[৭৪] আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ

'সুন্নাত হল ঈদের দিন (ঈদগাহে) হেঁটে বের হওয়া এবং বের হওয়ার আগে কিছু খাওয়া।'[৭৫]

৭. শারঈ ওযর ছাড়া ঈদের সালাত খোলা মাঠ বা ঈদগাহে আদায় করা : শারঈ ওযর (অসুবিধা, বৈধ কারণ) ছাড়া ঈদের সালাত ঈদগাহে আদায় করা সুন্নাত। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

'রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে বের হতেন। প্রথমেই তিনি সালাত আদায় করতেন, তারপর ফিরে আসতেন এবং লোকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, উপদেশ দিতেন, নির্দেশ দিতেন। যদি তিনি কোনো সেনা দল প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করতেন, তাহলে তা পাঠাতেন অথবা কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিতেন, তারপর ফিরে যেতেন।'[৭৬]

৮. ঈদগাহে যাওয়ার সময় নিম্নস্বরে নিচের তাকবীর পাঠ করা: ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যাওয়ার সময় নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এবং ঈদের আনন্দ প্রকাশের অন্যতম উপায়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো, তিনি তোমাদের যে পথনির্দেশ দিয়েছেন সেজন্য, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।'[৭৭] রাসূল ﷺ ঈদের দিন নিচে উল্লেখিত তাকবীরটি পাঠ করতেন,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الحَمْدُ

'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।'

ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে এই তাকবীর পাঠ করা এবং ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাবার সময় পথে এ তাকবীর আওয়াজ করে পাঠ করা সুন্নাহ।[৭৮]

৯. ঈদের দিন শুভেচ্ছা বিনিময় : ঈদের দিন সাহাবায়ে কেরাম تَقَبَّلَ اللهُ مِنّا وَمِنْكُمْ বলে পরস্পরে একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ "تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ".

'নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন ঈদের দিনে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পক্ষ থেকে (ইবাদত) কবুল করুন।'[৭৯]

---

[৭২] মুস্তাদরাকে হাকীম হা : ৭৫৬০; সনদ সহীহ।
[৭৩] তিরমিযী হা : ৫৪২।
[৭৪] আবূ দাউদ হা : ১১৪৩।
[৭৫] আবূ দাউদ হা : ১১৫৭; সনদ হাসান।
[৭৬] সহীহ বুখারী হা : ৯৫৬।
[৭৭] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৮৫।
[৭৮] মুস্তাদরাকে হাকীম হা : ১১০৫।

১০. ঈদের সালাত গুরুত্বের সাথে আদায় করা : ঈদের সালাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি ফরয না হলেও অধিকাংশ ফক্বীহ এটিকে ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাত কখনো পরিত্যাগ করেননি, তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করা উচিত। উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

أَمَرَنَا –يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ– أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

'নাবী কারীম ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, ঈদের দিনে আমরা যুবতী মেয়েদের এবং পর্দানশীন নারীদেরও ঈদগাহে বের করে আনব।'[৮০] এই হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি নারীদেরকেও এতে অংশগ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

'আমি নবী ﷺ এর সঙ্গে ঈদের সালাতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে সালাত আদায় করলেন, তারপর খুতবা দিলেন।'[৮১]

১১. মহিলাদের ব্যবস্থা থাকলে ঈদগাহে মহিলাদেরও অংশগ্রহণ : ইসলাম শর্তসাপেক্ষে মহিলাদেরকেও ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। উম্মে আতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، حَتَّى تَخْرُجَ الْجَارِيَةُ وَالْحَائِضُ، وَلْيَكُنَّ فِي صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَدُعَائِهِمْ

'রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন নারীদের, এমনকি ঋতুস্রাব অবস্থায় থাকা মহিলাদেরও ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তবে তাদের সালাত না পড়ে মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় অংশগ্রহণ করা উচিত।'[৮২]

মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার শর্ত :

১. ঈদগাহে একান্তভাবে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা, যেমন : আলাদা জায়গা, নিরাপত্তা ইত্যাদি।

২. শরীয়তের দিক থেকে পরিপূর্ণতা। মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার উদ্দেশ্য ঈদগাহে ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ নয়, বরং মুসলিমদের সঙ্গে দু'আ, খুশি এবং ঈদের আনন্দে শামিল হওয়া।

৩. অস্বস্তিকর পরিস্থিতি না হওয়া। মহিলাদের জন্য কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি (যেমন- ইভটিজিং বা শারীরিক দুর্ব্যবহার) হলে তাদের ঈদগাহে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

১২. ঈদের দিনে প্রশিক্ষণ স্বরূপ শিশুদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া :

ঈদে শিশুদের অংশগ্রহণ একটি আনন্দদায়ক ও সুন্নাত অনুসরণীয় আমল। ঈদ ইসলামী সমাজের আনন্দের দিন এবং এটি সকল বয়সের মুসলিমদের জন্য উদযাপন করা উচিত, বিশেষ করে শিশুরা যাতে ঈদ উদযাপন ও আনন্দের মধ্যে অংশ নিতে পারে। সেজন্য নাবী ﷺ শিশুদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

فَرِحَ النَّاسُ يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النَّبِيَّ ﷺ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَأْمُرُ بِالْحَمَامِ لِلْغُرَبَاءِ؟" فَقَالَ ﷺ: "الْغُرَبَاءُ فِي عِيدٍ لَا تَجُزُّهُ أَيْنَمَا كَانَ

'একদা ঈদের দিনে মানুষ আনন্দ করছিল এবং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি غُرَبَاء (অপরিচিত বা দূরের লোকদের) জন্য ঈদের আনন্দের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা করতে বলবেন? এতে নবী (ﷺ) বললেন, 'অপরিচিতরা ঈদের দিনে অংশ নিতে পারে, তারা যার মধ্যে খুশি থাকে তা গ্রহণ করে।'[৮৩] ঈদগাহে শিশুদের উপস্থিতি ঈদের আনন্দের অংশ, যা মুসলিম সমাজের ঐক্য ও বন্ধুত্বকে শক্তিশালী করে।

শিশুদের অংশগ্রহণের প্রমাণ :

১. ঈদের দিন নবী ﷺ শিশুদের সাথে আনন্দ করতে উৎসাহিত করতেন : নবী ﷺ এর সময়কালে ছোট ছোট শিশুরা ঈদের দিন উপস্থিত থাকত এবং মসজিদে তাদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হত।

[৭৯] ফাতহুল বারী ২/৪৪৯।
[৮০] সহীহ বুখারী হা : ৯৮০; সহীহ মুসলিম হা : ৮৯০।
[৮১] সহীহ বুখারী হা : ৯৫৬; সহীহ মুসলিম হা : ৮৮৪।
[৮২] সহীহ বুখারী হা : ৯৮০; সহীহ মুসলিম হা : ৮৯৩।
[৮৩] সহীহ বুখারী হা : ৮৯৯।

২. নবী ﷺ শিশুদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন : নবী ﷺ তার সন্তানদের এবং সাহাবীদের শিশুদের জন্য ঈদ উদযাপন করতে উৎসাহিত করতেন, তাদের সাথেও ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতেন।

৩. শিশুদের জন্য খুশি প্রকাশ করা : নবী ﷺ শিশুদের জন্য বিশেষভাবে ঈদের দিনে আনন্দকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতেন এবং তারা যেন ঈদের আনন্দে অংশ নিতে পারে তার জন্য সে দিনটিকে উজ্জ্বল এবং স্মরণীয় করে তোলার জন্য চেষ্টা করতেন।

১৩. ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ঈদগাহ থেকে বাড়ীতে আসা : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন সাধারণত এক পথ দিয়ে যেতেন এবং ভিন্ন পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

'নবী ﷺ ঈদের দিন এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন।'[৮৪]

১৪. কুরবানী করা : ঈদুল আযহার প্রধান ইবাদত হলো কুরবানী। অধিকাংশ আলেমদের মতে উট, গরু ও ছাগল-এই জন্তুগুলো কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ; এদের নর-মাদি উভয়ই বৈধ এবং ভেড়া ও দুম্বাও ছাগলের অন্তর্ভুক্ত।[৮৫] তবে হানাফি মাযহাবসহ কিছু আলেমের মতে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। এই মতকে শক্তিশালী বলেছেন ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তাই যার সামর্থ্য আছে, তার জন্য কুরবানীর ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়। অতএব, কোনো স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান মুমিন ব্যক্তির জন্য কুরবানীর ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

من كان له سَعَةٌ ولم يُضح؛ فلا يقربن مُصَلَّانا

"যার সামর্থ্য আছে কিন্তু কুরবানী দেয় না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে-কাছেও না আসে।"[৮৬] তবে এটি আবশ্যক নয় যে, সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে আবশ্যক মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, বেলাল, আবু মাসউদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৮৭]

১৫. কুরবানীর গোশত বণ্টন করা : কুরবানীর গোশত বণ্টন করাও ঈদুল আযহার অন্যতম কাজ। কুরবানীদাতার জন্য নিজে খাওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দেওয়া এবং গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ "তোমরা তা থেকে খাও এবং দুঃস্থ-দরিদ্রকে খাওয়াও"[৮৮] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "তোমরা তা থেকে খাও এবং সন্তুষ্ট ও প্রার্থী উভয়কে খাওয়াও"[৮৯] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا "তোমরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করো"[৯০]

উলামাদের মতে, এক-তৃতীয়াংশ নিজে খাওয়া, এক-তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া এবং এক-তৃতীয়াংশ সদকা করা উত্তম; এ মতটি ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত। তবে এর চেয়ে বেশি নিজে খেলেও সমস্যা নেই। মূলকথা, কুরবানীর গোশত এমনভাবে বণ্টন করা উচিত যাতে গরিবদের অধিকার রক্ষা হয় এবং সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।

১৬. ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করা : ইসলাম ধর্মে ঈদ এবং উৎসবের দিনগুলোতে বৈধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করা অনুমোদিত। তবে এটি অবশ্যই শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ

[৮৪] সহীহ বুখারী-৯৮৬।
[৮৫] সূরা আল-আনআম আয়াত : ১৪৩-১৪৪।
[৮৬] সহীহ জা'মে- ৬৪৯০; ইবনে মাজাহ- ৩১২৩।
[৮৭] মিরআতুল মাফাতিহ ৫/৭১-৭৩।
[৮৮] সূরা আল-হজ্জ আয়াত : ২৮।
[৮৯] সূরা আল-হজ্জ আয়াত : ৩৬।
[৯০] সহীহ বুখারী হা : ৫৫৬৯।

‘ঈদের দিনে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমার পাশে দুইজন কিশোরী গান গাচ্ছিল এবং ঢোল বাজাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে তিরস্কার করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, ‘হে আবু বকর! তাদের ছেড়ে দাও, কারণ এটি ঈদের দিন।’[৯১]

আনন্দ প্রকাশের কিছু বৈধ পদ্ধতি :

১. হালাল বিনোদন (যেমন : নাশিদ, ইসলামিক গান, ক্রীড়া অনুষ্ঠান) করা।

২.পরিবার ও আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটানো।

৩. সদকাহ বা দান-খয়রাত করা।

৪. বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়া ও তাদের জন্য উপহার দেওয়া।

৫. প্রসন্ন ও হাসিমুখ থাকা এবং পরস্পরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো।

❖ **ঈদুল আযহার বর্জনীয় :** মুমিন ব্যক্তি ঈদের দিন আল্লাহর নিয়ামতের ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং মাগফিরাত লাভের আনন্দে আনন্দিত হবে। তবে এ আনন্দ অবশ্যই শরীয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। ঈদ হলো ইবাদত ও কৃতজ্ঞতার দিন, পাপ-পঙ্কিলতার নয়। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্জন করা উচিত-

১। শারঈ কোনো কারণ ছাড়া ঈদের সালাত আদায় না করা।

২। ঈদের দিন এবং যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সিয়াম পালন করা।

৩। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী থেকে বিরত থাকা।

৪। কুরবানীর নিয়তকারীর জন্য যিলহজ্জের চাঁদ দেখা থেকে কুরবানী সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত চুল, নখ বা শরীরের কোনো অংশ কাটা।

৫। মানুষকে দেখানো বা খুশি করার উদ্দেশ্যে কুরবানী করা (রিয়া)।

৬। কুরবানীর গোশত বা চামড়া বিক্রি করা।

৭। কসাইকে মজুরি হিসেবে গোশত বা চামড়া দেওয়া।

৮। গরিব ও আত্মীয়দের হক উপেক্ষা করা।

৯। বিজাতীয় আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির অনুসরণ করা

১০। নারীদের বেপর্দা ও খোলামেলা চলাফেরা করা।

১১। গান-বাজনা, ডিজে পার্টি ও অশ্লীল বিনোদনে ব্যস্ত থাকা।

১২। অনলাইন ও অফলাইনে অযথা সময় নষ্ট করা।

১৩। সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতে গাফলতি করা।

১৪। হারাম খাদ্য ও পানীয় (ধূমপান, মাদক ইত্যাদি) গ্রহণ করা।

১৫। জুয়া খেলা ও আতশবাজি ফোটানো।

১৬। অপচয় ও অপব্যয় করা।

১৭। বিনোদনের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা।

১৮। নিজের আনন্দের কারণে অন্যকে কষ্ট দেওয়া বা সীমালঙ্ঘন করা।

মূলকথা, ঈদের আনন্দ হবে হালাল, সংযত ও আল্লাহমুখী- যেখানে থাকবে ইবাদত, কৃতজ্ঞতা ও শৃঙ্খলা, কিন্তু থাকবে না পাপ, অশ্লীলতা ও অপচয়।

উপসংহার

ঈদুল আযহা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব, যা কেবল আনন্দের নয়; বরং ত্যাগ, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বাস্তব শিক্ষা দেয়। এই উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর আত্মত্যাগের মহিমা এবং ইমানের দৃঢ়তার আদর্শ। আমাদের সমৃদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই ঈদের পবিত্রতাকে আরো অর্থবহ করে তোলে। তাই এই দিনে এমন কোনো আচরণ বা অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ যেন না ঘটে, যা ঈদের পবিত্রতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে; সে বিষয়ে সকলেরই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

আসুন, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ঈদ পালন করি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করি। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে ঈদুল আযহা পালনের তাওফীক দান করুন, আমীন।❑❑

[৯১] সহীহ বুখারী-৯৫২; সহীহ মুসলিম-৮৯২।

১২৫৮ : বাগদাদের পতনের মর্মান্তিক ইতিহাস

যাহীন যামান*

পূর্বে প্রকাশের পর

অধঃপতনের সূচনা : আব্বাসী খিলাফতের পতনের সূচনা হয় খলিফা মুতাসিমের মৃত্যুর পর। আর ভালোভাবে দুর্বলতা ফুটে উঠতে শুরু করে খলিফা মুতাওয়াককিলের মৃত্যুর পর থেকে। আব্বাসী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ সেনাবাহিনীতে প্রচুর তুর্কি সৈন্য নিয়োগ দেন। মূলত এই সিদ্ধান্তটি আব্বাসী খিলাফতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরবর্তীতে আব্বাসী শাসকদের থেকে এই তুর্কি উজির সেনাপতিতের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। যার কারণে তারা তাদের ইচ্ছামতো শাসক বসায় আর পতন ঘটায়। যারা তাদের বিরুদ্ধে যেতে চাইত তাদের খলিফা মুতাওয়াককিলের মতো ভাগ্য বরণ করে নিতে হত। খলিফা মুতাওয়াক্কিলকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তুর্কি সেনাপতি বোগা কবির হত্যা করে।

তাতারদের উত্থান : মঙ্গোলীয় তাতারেরা মধ্য এশিয়ার জাতি। মঙ্গোলিয়া তাদের আবাসভূমি। নির্মমতা, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং অস্থির প্রকৃতির বেশ কিছু জাতির সামগ্রিক রূপ হিসেবে এরা সমাধিক পরিচিত। এদের প্রধান পেশা ছিলো লুটতরাজ ও পশুশিকার। এক সাধারণ গোত্রপতি থেকে মোগলদের জাতির পিতা এবং তাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিচিত হন তেমুজিন - চেঙ্গিস খান। যার নামের অর্থই শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি মোগল গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে মঙ্গল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।

তারা সর্বপ্রথম আক্রমণ করে চীনে। চীনে হামলা চালিয়ে চীন দখল করে ১২১২ সালে।

চীন দখলের মাঝেই চেঙ্গিস খানের নজর পড়ে মুসলিম এলাকাগুলোর দিকে। তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম রাজ্য থেকে সে তার আক্রমণ শুরু করে। এরপর সে খাওয়ারিজম শাহ এর সাম্রাজ্য ধ্বংস করে বোখারার দিকে হাত বাড়ায় এবং বোখারা ধ্বংস করে। শেখানকার অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে। সেখান থেকে সমরকন্দ ও অন্যান্য শহরগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে চেঙ্গিস বাহিনী। চলতে থাকে নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। তুর্কিস্তানের পতন অর্থাৎ ১২২০ পর্যন্ত এই ধ্বংসলীলা চলতে থাকে।

চেঙ্গিস ১২২৭ সালে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী রুমে ফিরে আসার পর মারা যায়। তার পুত্রকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যায়।

তার উত্তরাধিকারী ওগোজী খান এর আমলে মঙ্গল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারণ ঘটে।

ওগোজী খানের সবচেয়ে ছোট ছেলের (হালাকু খান) হাতে নেতৃত্ব আসে। তার নেতৃত্বেই মুসলিম দেশগুলো তে মঙ্গোলদের অভিযান পরিচালিত হয়। তার বাহিনীর সহিংস পদচারণা চলতে থাকে পারস্য, ইরাক ও সিরিয়ার বুকে। গণহত্যা চলতে থাকে সবখানে। শহর ও গ্রাম পুড়িয়ে তাদের বাহিনী এগিয়ে যেতে থাকে বাগদাদের দিকে।

বিশ্বাসঘাতকতা : একটা মর্মান্তিক কাহিনী উল্লেখ করি।

"খোরাসানেও বাগদাদের মতো হানাফি ও শাফেইদের ভিতর তুমুল সংঘর্ষ চলছিল। তুস নগরের হানাফিরা শাফেইদের জিদে পড়ে হালাকু খানকে আমন্ত্রণ করল এবং নিজেরাই নগরের সিংহদ্বার তাতারি বাহিনীর জন্য উন্মুক্ত করে দিল। কিন্তু তাতারিদের তরবারি যখন নিষ্কোষিত হল তখন তারা শাফেইদের সঙ্গে হানাফিদেরও রেহাই দিল না। হানাফি ও শাফেই সকলকেই নিঃশেষিত করে ফেলল।[৯২]

কাহিনীটা সত্য বলতে বেশ হাসির ও আবার কষ্টেরও। যাই হোক, খোরাসানের পতন বাগদাদ অভিযানের পথ মুক্ত করে দিল। হালাকুর মন্ত্রী ছিলো নাসিরউদ্দিন তুসি আর খলিফা মুসতাসিম বিল্লাহর মন্ত্রী ছিলো ইবনুল আলকামি। এই দুই নিমক হারাম শয়তান ছিলো গোঁড়া রাফেজি শিয়া যারা সুন্নিদের প্রতি ভীষণ বিদ্বিষ্ট ছিলো। তুসি ইতঃপূর্বে আলমুৎ দুর্গে ইসমাইলি রফেজীদের মন্ত্রী ছিলো। তার কুখ্যাত ইসলামবিদ্বেষ হালাকুর নৈকট্য লাভের পক্ষে শহ্যক হয়েছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় যেমন হালাকু খাঁ বাগদাদ আক্রমণের জন্য বিরাট আকারে প্রস্তুত হচ্ছিলেন অন্যদিকে ইবনুল অ্যালকেমির বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে বাগদাদে সৈন্য বাহিনীর সংখ্য মাত্র ১০ হাজার অশ্বরোহী সৈন্যে পরিণত করা হয়েছিল।[৯৩]

ইবন খালদুন লিখেছেন, "ইবনুল আলকেমি তার বন্ধু আরবেলের সুলতান ইবনুস সালায়াকে লিখেন যাতে

---

* ঢাকা কলেজ।

[৯২] তরজুমানুল কুরআন (শরহে নহজুল বালাগাত, ইবনে আবির হাদিদ [২] ৪৯৩ পৃষ্ঠা)।

[৯৩] ইবন কাসির, আল বিদায় ওয়ান নিহায়া [১৩] ২০১ পৃষ্ঠা।

হালাকু খাঁকে বাগদাদ আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেন। হালাকু আলমুৎ দুর্গ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার অববহিতকাল পূর্বে ইবন অ্যালকেমির এই পত্র তার হস্তগত হয়।"[৯৪]

সৈয়দ রশিদ রিজা তার তাফসিরে লিখেছেন, "বাগদাদের ইতিহাস পাঠ কর - তাতারি অভিযানের দুর্ঘটনা, যার ফলে পৃথিবীতে মুসলিম গৌরবের ভিত্তি প্রকম্পিত হয় এবং মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তার অন্যতম কারণ ছিলো হানাফি-শাফেই কলহ এবং খলিফার শিয়া মন্ত্রী ইবনুল আলকেমি। এই মন্ত্রী সুন্নিগণের নিধনকল্পে তাতারি নররাক্ষসদের ৬৫৬ হিজরিতে খিলাফতে ইসলামিয়ার রাজধানী বাগদাদে ডেকে আনে। কিন্তু তাতারিরা যখন বাগদাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল তারা শিয়া অ-শিয়া সকলকেই নৃশংস ভাবে হত্যা করতে পশ্চাৎপদ হয়নি। ইবনুল আলকেমিকে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য স্বয়ং হালাকু খাঁ তিরস্কার করেছিল এবং ইবনুল আলকেমি তার অভিশপ্ত জীবন এর দুর্ভাবনায় অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।"[৯৫]

ঐতিহাসিক ইবন কাসির লিখেছেন, "শিয়া মন্ত্রীদ্বয়ের ষড়যন্ত্র ও প্ররচনার ফলে খলিফা মুস্তাসিমের শত অনুনয়, বিনয় ও অনুরোধ সত্বেও হালাকু তার সাথে সন্ধি স্থাপন করতে রাজি হলেন না। মন্ত্রীরা হালাকুকে বুঝিয়েছিলেন যে, সন্ধি বেশিদিন স্থায়ী হবে না এবং দুই এক বছর যেতে না যেতেই খলিফা বিদ্রোহ করবেন। এই দুই ইসলামবিদ্বেষী শিয়া মন্ত্রীর উসকানির ফলেই শেষ পর্যন্ত হালাকু খলিফা মুস্তাসিমের প্রাণ ভিক্ষা দিতেও রাজি হলেন না। ইসলাম জগতের খলিফাকে অতিশয় নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হলো ।যাহাবী, ইবন কাসির, ইবনুল ইমাদ, সুয়ুতি লিখেছেন যে, হিংস্র তাতারীগণ লাথি মারতে মারতে খলিফা মুস্তাসসিমকে হত্যা করেছিল।

ইবন খালদুন বলেছেন, খলিফাকে চটের বস্তায় পুরে কুঠার দিয়ে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল।[৯৬]

আমার মনে হয় না আমার নিজ থেকে কিছু বলা প্রয়োজন, আমাদের পূর্ববর্তী আলিমদের ইতিহাসই যথেষ্ট বিশ্বাস ঘাতকতার প্রমাণ দিতে। কতটা ইসলাম বিদ্বেষ, ক্ষমতা লোভ আর শয়তান হলে একজন লোক এভাবে নিজের দেশে অন্য একদল নরপশুকে আমন্ত্রণ করতে পারে? এটা কি ভাবার বিষয় নয়? এটাই রাফেজি শিয়াদের প্রকৃত চেহারা, তাদের প্রকৃত ইতিহাস, যুগে যুগে তার এভাবে আমাদের খিলাফত ধ্বংসের জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। একটা বাস্তবতা হলো-

"মুসলিমরা নিজের প্রকাশ্য শত্রুদের সাথে কখনও যুদ্ধে হারেনি, তারা বারবার পরাজিত হয়েছে ভিতরের তুসি আর ইবনুল আলকেমিদের জন্য। আস্তিনের সাপরাই ইসলামের গৌরবান্বিত খিলাফত ধ্বংসের মূল কারিগর।"

ইলমের শহরের চূড়ান্ত পতন :

আমরা যতই বিশ্বাসঘাতকদের দোষ দেই না কেন, মূল সমস্যা ছিলো শাসন ক্ষমতার ভিতরে। অযোগ্য, অদূরদর্শী শাসকেরা তাদের চারপাশে সব আস্তিনের সাপকে বসিয়ে রেখেছিলেন। তারা মানুষ চিনতেন না। যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে রাখতেন। আর যদিও বা তাদের কাছে টানতে চাইতেন, তাহলে উজির, সেনাপতিরা ষড়যন্ত্র করে খলিফারই পতন ঘটিয়ে দিতো। যাক এবার বাগদাদের ধ্বংসস্তূপের দিকে নজর দেয়া যাক।

প্রফেসর ব্রাউন লিখেছেন যে, বাগদাদে তাতারদের হত্যা উৎসব আট দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। আট লাখ নাগরিক নিহত হয়।

হালাকুর বাগদাদে প্রবেশের দিন হতে খলিফার শাহাদাত পর্যন্ত ৩৩ দিন অতিবাহিত হয়েছিল, কিন্তু ইবন কাসির ও ইবন ইমাদ লিখেছেন, ৪০ দিন আর যাহাবী বলেছেন ৩৪ দিন। দিন ও রাতের সকল সময় অবাধে হত্যাকাণ্ড চলেছিল।

নিহতদের সংখ্যা : ইবনে খালদুনের মতে তেইশ লাখ, যাহাবী ও ইবনুল ইমাদের মোট আটাশ লাখ, ইবন কাসির আট লাখ হতে প্রায় চল্লিশ লাখ বলে উধৃত করেছেন।

স্ত্রী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ কাউকেই বাদ দেয়া হয় নাই। আব্বাসের বংশধরদের সকল সন্তানকে কবরস্থানে সমবেত করে ছাগলের মতো জবাই করা হয়েছিল। খলিফার কনিষ্ঠ পুত্র মুবারক, তিন কন্যা ফাতিমা, খাদিজা ও মরিয়ম এবং রাজপ্রাসাদের থেকে সহস্র কুমারীকে নরপিশাচের দল দাস-দাসীতে পরিণত করেছিল।

ইমাম ইবনে জাওযির পুত্র ইমাম মহিউদ্দিন ইউসুফ এবং তার তিন পুত্র আবদুল্লাহ, আব্দুর রহমান ও আব্দুল

[৯৪] ইবনে খালদুন, [৫] ৫৪ পৃষ্ঠা।
[৯৫] তাফসির আল মানার [৩] পৃষ্ঠা ১০।
[৯৬] ইবন খালদুন [৫] ৫৪৩ পৃষ্ঠা।

করিম, মুজাহেদউদ্দিন আইবেক, শিহাবুদ্দিন আলী এবং সুন্নি উলামা, ফকিহ, মুহাদ্দিস, হাফিজ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। সমস্ত নগর অগ্নিদগ্ধ, মসজিদ, মদরাসা, কলেজ, খানকা শ্মশানে পরিণত হয়। ছয় শতাব্দী ধরে বাগদাদে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অমূল্য গ্রন্থ ভান্ডার সঞ্চিত হয়েছিল, তাতারি বর্বরের দল এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্তই দিজলার বুকে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

শেষ পরিণতি সম্পর্কে ইবন কাসির লিখেছেন,"অদৃষ্টে যা ঘটবার ছিলো যখন তা ঘটে শেষ হলো এবং চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখন ইসলাম জগতের কেন্দ্র মহানগরী বাগদাদ শুধু ধ্বংসস্তূপের আকারে অবশিষ্ট ছিলো, কদাচিৎ লোক দৃষ্টিগোচর হত। পথে ঘাটে শব দেহগুলো ঢিপির মতো থাক লেগে পড়ে ছিলো। বৃষ্টির কারণে লাশগুলো পচে আকাশ ও বাতাস দুর্গন্ধে পূর্ণ করে তুলেছিল। বায়ু দূষিত হওয়ায় ভীষণ মড়ক দ্রুত বেগে বিস্তার লাভ করছিল এবং সিরিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ইরাক ও শামের অধিবাসীবৃন্দ একযোগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং মৃত্যুর কবরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।"[৯৭]

শেষ করব প্রফেসর ব্রাউনের ভাষায়, "বাগদাদের লুণ্ঠনকার্য ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হয় এবং সপ্তাহকাল চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আট লাখ অধিবাসীকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে বাগদাদ মহানগরী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আব্বাসী খলিফাগনের বিশাল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রস্থল ছিলো তার সমুদয় ধনসম্ভার এবং সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পদ যা দীর্ঘকাল হতে সঞ্চিত হয়ে আসছিল সমস্তই লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তাতারিদের দ্বারা মুসলিম সংস্কৃতির যে মহান সর্বনাশ সাধিত হয়েছিল পরবর্তী যুগে তা কখনও পূরণ হতে পারেনি। এই ক্ষতির বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব এবং কল্পনার অতীত। কেবল যে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থরাজি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছিল তা নয়, অগণিত বিদ্যজ্জন মণ্ডলীর বিনাশ সাধন দ্বারা অথবা রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ নিয়ে তাদের পলায়ন করার কারণে মৌলিক গবেষণার পদ্ধতি এবং সঠিক রেওয়ায়তসমূহের সনদগুলো যা আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট ছিলো সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় বিরাট ও মহান সভ্যতাকে এত দ্রুত আগুনে ভস্মীভূত ও রক্তসমুদ্রে পরিণত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।"

ফিনিক্স পাখির জন্ম :

আল্লাহর কী ইচ্ছা! যেই তাতাররা বাগদাদ তছনছ করে দিয়েছিল, ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল সেই তাতারদেরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেন নিজেদের লোক দিয়েই।

হালাকু খানের চাচাতো ভাই সুলতান বারকে খান ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসেন। তিনি মোগলদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেন এবং হালাকু খানকে পরাজিত করেন। বারকে খান ছিলেন রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার আমির। এই এলাকায় অনেক মুসলিম বাস করত। মুসলিম আলেম, ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাগদাদের পতনের কাহিনী তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে এবং তিনি হালাকুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ফলে বারকে খান আর হালাকু খানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বারকে খান জিতেন। এই যুদ্ধের ফলে মোগল তাতারদের মধ্যে বিভক্তির সূচনা হয়। এখান থেকেই মোগলদের পতনের সূচনা।

উপসংহার : আব্বাসী আমল ছিলো মুসলিমদের স্বর্ণযুগ। ইসলামিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, অনুবাদ আন্দোলন সব দিক থেকেই মুসলিমরা তখন বিশ্বে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো। পুরো মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হত বাগদাদ থেকে। সেই খিলাফত মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তছনছ করে দিয়েছিল মোগল তাতারেরা। বাস্তবতা হলো, এই পতনের পেছনে সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিলো বিশ্বাস ঘাতকতা এবং মুসলিমদের অনৈক্য। বর্তমান বিশ্বে আমাদের কোনো খিলাফত নেই। প্রায় ১১০ বছর মুসলিমরা খলিফাবিহীন। হয়তো আগের মতো মাজহাবের দ্বন্দ্ব ওইরকম তীব্র নেই, তবে বর্তমানে নতুন জাহেলিয়াত হলো জাতীয়তাবাদ। মুসলিমরা নিজের মুসলিম পরিচয়ের ওপর জাতির পরিচয় দিচ্ছে, দেশের পরিচয় দিচ্ছে। আমাদের এই মনোভাব ভাঙতে হবে। মুসলিমদের পুনরায় ঐক্যবোধ করতে হবে, নাহলে মুসলিমদের রক্ষা নেই। বর্তমানে যেভাবে তারা দুনিয়ার প্রত্যেকটি কোণায় মার খাচ্ছে সেভাবে মার খেতেই থাকবে। আল্লাহ আমাদের কাবুল করুক। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হাওয়ার তৌফিক দান করুক। আমিন ইয়া রাব্বাল আল আমিন। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[৯৭] ইবন কাসির, ২০২ - ২০৫ পৃষ্ঠা, শজরাত [৫] ২৭০ পৃষ্ঠা, ইবন খালদুন [৫] ৫৪৩ পৃষ্ঠা ও দুওয়ালুল ইসলাম [২] ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা

শুব্বান পাতা

صفحات الشبان

প্রগতির স্রোতে নারীর অশ্লীলতা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম *

ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত সামগ্রিক কল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থার নাম। নিছক কোনো একটি ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামের সীমাবদ্ধতা ধারণ করে না। বরং সকল সীমাবদ্ধতার গন্ডি পেরিয়ে ইসলাম সহ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ কল্যাণকর দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে এবং সময়, ক্ষেত্র, পরিবেশের অবস্থার পরিবর্তনে ইসলামের কল্যাণকামিতা আরো বেশি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সুদৃঢ় হয়ে থাকে। যুগের ঝাঁঝালো রঙিন চশমা পরে আধুনিকতা কিংবা আধুনিকায়নের বয়ান শুনে, ফ্যাশন শো করে নিজেকে হয়তো প্র্যাকটিসিং মুসলিমের চাইতে খানিকটা ভালোই মর্ডান মনে করে নিজেকে এলিট সোশ্যালিস্ট কিংবা প্রগতিশীল মনে করা, নিঃসন্দেহে এই ধারণা লালনকারীর কাছ থেকে বাহ্বা, প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে। আর শয়তানের দাসত্ব শিকার করে গাল এদিক ওদিক ফুলিয়ে দাঁত খিলখিলিয়ে বলে - ইসলাম সেকেলে ধর্ম! ইসলাম প্রগতিশীল ধর্ম কিংবা ইসলামে আধুনিকতার কোনো লেশমাত্র নেই!

এমন অনেক আপত্তি, অভিযোগ আর শয়তানি বক্তব্য প্রদান করলেও এই নাদানের দলেরা জানে না যে, ইসলামই একমাত্র প্রগতিশীল, আধুনিক ধর্ম। যত মন্ত্র, তন্ত্র আর ধর্ম বলেন সবগুলোই পেছনে পড়েছে ইসলাম স্বয়ং স্বমহিমায় কিয়ামত পর্যন্ত সকলের কাছে শতভাগ বিশুদ্ধ, অবিকৃত, গ্রহণযোগ্য ও সকল দিক ও বিভাগে কল্যাণকর নীতিমালা প্রদর্শন করে চলছে।

চলমান বিশ্বে যত উন্নতি, অগ্রগতি আর তথ্য প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য জয়জয়কার অবস্থার পিছনে ইসলামের যে কত অবদান সেটা কি কখনও কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

এই যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নারীদের পিছিয়ে রাখা, তাঁদের ভোগপণ্যের বস্তুতে পরিণত করা, শয়তান বলে দোষারোপ, গালমন্দ করা নিঃসন্দেহে এটা কোনো প্রগতি কিংবা আধুনিকতার কাতারে পড়ে না। আরেকটি দিক হলো - তাঁদের দেহকে কুরুচিপূর্ণ পণ্য হিসেবে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রদর্শন করার যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা অথবা নারীদের অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন, কামোদ্দীপনা সৃষ্টিকারী অসুস্থ বিকৃত মানসিকতা ও প্রতিযোগিতার যে আয়োজন এটাকেও কোনো সুস্থ রুচিশীল মানুষ আধুনিকতা কিংবা প্রগতিশীল বলবে না।

অথচ গোটা বিশ্বের দিকে তাকান! নারীরা আজ ভোগের বস্তু হিসেবে টয়লেট টিস্যুর মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁদেরকে সিনেমা টেলিভিশন থিয়েটার বিজ্ঞাপন পত্রপত্রিকায় নগ্ন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। যৌন আবেদনমূলক অশ্লীল ও অশোভন অভিনয় নাচ গান বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। আর এই অশ্লীলতাকে স্বাভাবিকভাবে দেখানোর জন্য পাশ্চাত্য সমাজের আধুনিক রঙিন চশমা পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী অশ্লীলতার মহড়াকে নারীদের চিন্তা, রুচির জায়গাকে এমনভাবে দখল করেছে যে, এখান থেকে সুস্থ, রুচিশীল মানসিকতার জগতে প্রবেশ করার এই বিশাল রণক্ষেত্রে সে যেন এক অসহায় অস্ত্রহীন যোদ্ধা!

নারীদেরকে অন্য পণ্যদ্রব্য হিসেবে এবং যাবতীয় অশ্লীলতার কাজে ব্যবহার করার জন্যই মূলত তারা বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, থিয়েটার, বিজ্ঞাপন, সিনেমা, নাটক, লেখনি প্রকাশ করে থাকে। এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে তাদের

* শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামীক একাডেমী, ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর জেলা।

কাজে অংশগ্রহণ করায়। এই ক্ষেত্রে যারা তথাকথিত সুশীল সমাজ বিশেষ করে নারীবাদীরা যারা নারীদের সম্মান, স্বাধীনতা, অধিকারের কথা বলে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সভা সেমিনার করে পরিবেশেকে বেপরোয়া করতে মোটেও দ্বিধাবোধ করে না। অথচ এ বোবা শয়তানরা নারীদের বিভিন্ন জায়গায় শ্লীলতাহানি, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, গুম, হত্যার মতো ঘটনা নিউজ পোর্টালে কিংবা বিভিন্ন মাধ্যমে দেখেও এ ধরনের বর্বরতা, সর্বনাশের গোড়ার সমস্যা চিহ্নিত না করে উপরন্তু আরো বেশি লাগামহীন পদক্ষেপ, বক্তব্য, প্রকাশনা, কন্টেন্ট তৈরি করে পরিবেশকে আরো বিপরীত দিকে উস্কে দেয়। হায়রে নারীবাদী বুদ্ধিহীন সমাজ! নারীদের সভ্যতা, উৎকর্ষতা, সমুজ্জল ইতিহাস, ঐতিহ্যকে আড়াল করে সামান্য দুনিয়ার চাকচিক্যের চশমা পরিয়ে তাঁদের সতিত্বকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলায় মত্ত এটা কি এই বস্তুবাদী নারী সমাজের বিবেকের দুয়ারে একটুও নাড়া দেয় না!

প্রগতি ও ইসলাম ; সাংঘর্ষিক নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাংলা ভাষায় প্রগতি শব্দের অনেক অর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য - অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, উৎকর্ষতা ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলা হয় - Progress । ভাষার পার্থক্য কিংবা শব্দ প্রয়োগের ভিন্নতা থাক বা না থাক সেটা বিবেচ্য নয়। বরং উন্নতি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, উৎকর্ষতা যেটাই অর্থ গ্রহণ করেন না কেন ইসলাম প্রত্যেক অর্থের সাথে শতভাগ উপযুক্ত এবং শতভাগ শৃঙ্খলাবদ্ধ। প্রগতি যেভাবে সকল সেক্টরে উৎকর্ষতার দাবি, আবেদন করে ঠিক ইসলামের মৌলিক দাবিই হলো নিয়ম কানুন, আদেশ কিংবা নিষেধ সকল ক্ষেত্রে এবং সকল দিক ও বিভাগে শান্তি,সুখের আবহ বইয়ে দিবে এবং এই অশ্লীলতার গোলক ধাঁধার অন্ধকারের বুকে এক আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই আলোকিত করবে । সেইসাথে ব্যক্তি, পরিবার,সমাজ ও রাষ্ট্র সকলকে নিখাদ ধ্বংসস্তুপের মুখ থেকে উদ্ধার করে একটি উন্নত সমৃদ্ধ ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র গঠন করবে। ইসলাম মূলত এই প্রগতিকে ধারণ করে। যদিও প্রগতিশীল কিংবা আধুনিক প্রগতিবাদীর ইসলামকে প্রগতির ধর্ম হিসেবে মানতে নারাজ। যার কারণে তারা ইসলামের উপস্থিতিকে সহ্য করতে পারে না। ফলে এলার্জির পরিমাণটা এত বেশি বেড়ে যায় যে, যার দরুণ বলে - ইসলাম সেকেলের ধর্ম, ইসলাম নারীদেরকে পিছিয়ে রেখেছে, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে তাদেরকে দেউলিয়া করে একবারে পিছিয়ে পড়া জাতিতে পরিণত করেছে!

এমন খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ বহন করে। যদি প্রগতি মানে অশ্লীলতা হয়, যদি প্রগতি নারীর দেহকে সকলের ভোগের পণ্য বানায়, যদি প্রগতি মানে বিবাহ বহির্ভূত ফ্রি মিক্সিং, লিভ টুগেদার হয় তাহলে এই সকল প্রগতির বিরুদ্ধে ইসলাম তো আমাদের অবস্থান করতে বলবেই এবং এই সকল প্রগতির বিপরীতে সুস্থ রুচিশীল প্রগতির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ধারণের জন্য ইসলাম আমাদের কী অসাধারণ প্রগতির সবক দেয় তা নিশ্চয়ই সুপ্রিয় পাঠক মাত্রই জানে।

অশ্লীলতা যখন প্রগতির মোড়কে আবিষ্কৃত :

আধুনিক নারীবাদী, প্রগতিশীলরা যতই প্রগতির কথা বলুক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো - নারীদের লজ্জা আব্রুকে নষ্ট করা এবং তাদের দেহকে সহজলভ্য করে তোলা। অথচ নারীর সৌন্দর্য তাঁর লজ্জায়। কেননা নারী অর্থই লজ্জা। নারীর লজ্জাকে নষ্ট করতে পারলেই যখন যা মনে চাইবে তখন সেইভাবে পুতুল নাচের মত ইচ্ছেমত নাচাতে পারবে বলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার দালালেরা এই মিশনে নেমেছে। যদিও আমাদের সকলের জানা, শয়তান সর্বপ্রথম শয়তানি প্ররোচনা দিয়ে হাওয়া আলাইহিস সালাম ও আদম আলাইহিস সালাম-এর লজ্জাকে প্রকাশ করে। সেই সূত্রপাত ধরেই যুগে যুগে শয়তানের অনুসারীরা এভাবেই গ্লোবাল মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের সংবেদনশীল অঙ্গকে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সে কাজে বিভিন্ন বাস্তব ভিত্তিক নির্লজ্জতার চরম শিখরে পৌঁছে গিয়ে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে নারী ও পুরুষের মধ্যে। ফলত প্রগতির এই ভয়াল স্রোত যেন অশ্লীলতার এক কুরুচিপূর্ণ মোড়কে এই শতকের বিশ্বায়নের যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাক পরিধান ; নারীর পছন্দের সীমাবদ্ধতা নাকি স্বেচ্ছাচারিতা :

জাহেলী যুগে নারী তাঁর পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে পোশাক পরিধান কিংবা বর্জন করত। জাহেলী যুগ হওয়ার পরও তাদের পোশাক পরিচ্ছদ নির্ধারণ কিংবা পরিধানের মধ্যে ইবাদতের উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকত। তাফসিরের বিভিন্ন শাস্ত্রে এমন তথ্য পাওয়া যায় যে, তাদের কারো যদি পবিত্র পোশাক না থাকত তখন তারা (মহিলা) রাতের আঁধারে পবিত্র কাবা তাওয়াফ করত বস্ত্রহীন অবস্থায়। যদিও তাদের চিন্তার বিভ্রাট ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যটা ইবাদতমুখী ছিল। কিন্তু আজকের তরুণ-তরুণীরা আধুনিকতাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে এত বেশি সীমা লঙ্ঘনতার দিকে এগিয়ে গেছে যেটা বিগত জাতি সভ্যতার ইতিহাসকেও লজ্জিত, কলুষিত করে। পোশাক পরেও যেন বস্ত্রহীন! কত পাতলা, দামি, স্টাইলিশ পোশাক কিংবা কত আঁটোসাঁটো পোশাক পরিধান করে তরুণদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায় সেদিকেই মরিয়া আজকের ইয়াং তরুণীরা। এজন্য রাসূল ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন -

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

‘দুই শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী; যাদেরকে আমি দেখিনি। (তারা) প্রথম শ্রেণী (অত্যাচারীর দল) যাদের সঙ্গে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক, যদ্বারা তারা লোককে প্রহার করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সেই নারীদল; যারা কাপড় তো পরিধান করবে, কিন্তু তারা বস্তুতঃ উলঙ্গ থাকবে, যারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যাদের মস্তক (খোঁপা বাঁধার কারণে) উটের হিলে যাওয়া কুঁজের মতো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তার গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে, ।[৯৮]

মহান আল্লাহ তা‘আলা নারীদের শালীন পোশাক পরিধানের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

‘হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, ‘তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৯৯]

পোশাক পরিধানে ইসলামের নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিজ ইচ্ছামতো কাপড় পছন্দ করে সাজসজ্জা প্রদর্শনের ফলে নারীদের বখাটেদের লোলুপ দৃষ্টির শিকার ও ইভটিজিংয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে এই আধুনিকতার অন্ধত্ব আজকের নারীদের বিভিন্ন অশালীন পোশাক পরিধানে নারীর লজ্জা নামক সৌন্দর্যের ভূষণ নষ্ট হচ্ছে। অথচ ইসলামে নারী এবং পুরুষ, উভয়ের পোশাক পরিচ্ছদের স্বতন্ত্র স্টাইলের দিকনির্দেশনা বিদ্যমান। একজন পুরুষ যেমনভাবে তাঁর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখবে ঠিক একজন নারীও তাঁর পুরো শরীর ঢেকে রাখবে। কেননা নারীর পুরো শরীরই ঢেকে রাখার বস্তু। তবুও উভয়ের পোশাক পরিধানের কিছু নীতিমালা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

১. পোশাক খুবই আঁটোসাঁটো হবে না।

২. পোশাক খুবই পাতলা হবে না। যাতে শরীরের অবকাঠামো বুঝা যায়।

৩. পোশাক আকর্ষণীয় হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গের কেউ আকৃষ্ট হয়।

---

[৯৮] সহীহ মুসলিম হা : ৫৭০৪।
[৯৯] সূরা আহযাব আয়াত : ৫৯।

৪. অমুসলিমদের পোশাকের সাদৃশ্য হবে না।

অশ্লীলতার বিস্তৃতি; সমাজ কি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে না:

চলমান বিশ্বে অশ্লীলতার বিস্তৃতি লাগামহীনভাবে বাড়ছে। ফলে গোটা বিশ্ব যেন এক অশ্লীলতার সাগরে হাবুডুবু খাওয়ার উপক্রম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তো করুণ অবস্থা! লাগামহীন স্বাধীনতা এমন এক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা যেন প্রায় অসম্ভব। সেখানে যৌন বিপ্লবের (Sexual Revolution) নামে যে অশ্লীলতার কত ভয়াবহ শোচনীয় চিত্র উঠে তা শুনলে রীতিমত গায়ের লোম শিহরে ওঠে। বিবাহ বহির্ভূত ১০০ জন নারীর মধ্যে তো ৮৬ জন নারী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে স্বাধীনভাবে বসবাস করে খোদ ইংল্যান্ডের মতো দেশে। যাদের অধিকাংশই হলো ১৮-১৯ বছরের মেয়ে।[১০০]

ইউরোপ, আমেরিকা, চীনসহ কথিত উন্নত দেশের যৌন বিপ্লবের এই স্রোতে তো তারা ভেসে গেছেই সাথে এর বিশাল ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে গোটা বিশ্বে। ফলে আমাদের মতো এমন মুসলিম দেশেও ব্যাপক অশ্লীলতা, বেহায়াপনা সমাজের প্রত্যেক সেক্টরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে শয়তানের বাক্স টিভি - সিনেমা পাশ্চাত্য অসভ্যতাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে এই প্রভাবটা শিশুমনে এত শক্ত করে শিকড় গেড়ে বসে যা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্কের ভিতরে গেঁথে যায়। ফলশ্রুতিতে এই লাগামহীন অশ্লীলতা, ফ্রি মিক্সিং আর বেহায়াপনাকে নরমালাইজ করে দেখতে শুরু করে। ঠিক পরিবারের এমন স্বেচ্ছাচারী উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে পারিবারিক, সামাজিক বন্ধন খুইয়ে যাচ্ছে এবং সেইসাথে পরিবার থেকে লজ্জা, নীতি নৈতিকতা বিতাড়িত হচ্ছে। সমাজ, পরিবার এক জাহান্নামের গভীর খাদে পড়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যেখানে অশ্লীলতার এই বিস্তৃতি সমাজ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যদি এই সমাজের অভিভাবকগণ সচেতন না হয় তাহলে হয়তো মহান আল্লাহর গজব দিনে কিংবা রাতে আগমন করে নাপাক পৃথীবির দুর্গন্ধ বায়ু নির্গত করবে। তখন হয়তো আমাদের কোনো কিছু করার পথ ও পন্থা থাকবে না।

প্রগতির প্রচার প্রযুক্তি নাকি সুস্থ মানসিকতার চর্চার উন্নয়ন :

বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার নয় বরং অপব্যবহারের দরুণ ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার এমনকি রাষ্ট্রকে পর্যন্ত এর সীমাহীন ক্ষতির বেগ পোহাতে হচ্ছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা আর অভিভাবকদের সীমাহীন উদাসীনতায় পর্ণোগ্রাফি, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, সমকামিতাসহ জঘন্য অশ্লীল কাজে অনায়াসে জড়িয়ে পড়ছে। প্রগতির এই চরম স্রোতের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহে আজকের তরুণ-তরুণীরা প্রেম, ভালোবাসা, পরকীয়ার সাথে যেমন জড়িত হচ্ছে ঠিক বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটাচ্ছে। খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, নোংরা, অশ্লীল দুনিয়া আর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার এক বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলছে স্রেফ প্রযুক্তির অপব্যবহার আর সুস্থ মানসিকতার অপচর্চা। আগে তো এগুলো তেমন আলোচনায় আসতো না। এখন দিন যত যাচ্ছে তত ঘটনাপ্রবাহে বিশাল ভয়াবহ এক অনাগত নোংরা ভবিষ্যৎ উঁকি দিচ্ছে। ফলে এখন উচিত প্রযুক্তির অপব্যবহার নয় বরং সুস্থ মানসিকতার ব্যাপক পরিচর্যা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলতে চাই, প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে অশ্লীলতার সাগরে ডুবে থেকে নিজেকে সভ্য, মডার্ন কিংবা অতি আধুনিক দাবি নিছক নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা আছে? একটি জাতির উন্নতি অগ্রগতির অন্যতম মূলমন্ত্র হচ্ছে নীতি নৈতিকতাকে সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার রাখা এবং আদর্শিক বিপ্লব সাধন করা। যাতে করে যাবতীয় অশ্লীলতার কালিমা দূরীভূত করে একটি সুন্দর আগামীর জাতি গঠনে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া সময়ের অন্যতম দাবি। চলবে ইনশাআল্লাহ

[100] sehwarz Oswald, The psoology of sex, পৃষ্ঠা ৫০

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) সম্মানিত শায়েখ, আমি ঢাকা থেকে বলছি। আমার প্রশ্ন হলো, যদি বাবার সম্পদে হারাম থাকে তাহলে সম্পদ বণ্টনের সময় কি ছেলে মেয়ে সেটা গ্রহণ করতে পারবে?

মাহদী হাসান শিমুল, ঢাকা

উত্তর : যদি উত্তরাধিকারী জানে যে, মৃত ব্যক্তি তার সম্পদ অবৈধ উপায়ে অর্জন করেছে, তাহলে আলেমগণ অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকারের বৈধতার বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কিছু আলেম এই ধরনের সম্পদের উত্তরাধিকারকে বৈধ করেছেন, আবার অন্যরা তা নিষিদ্ধ করেছেন। আবার অন্যরা এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, সম্পদের মালিক কি তার সম্পদ হওয়া ব্যাপারে জানে, না কি জানে না? তারা বলেছেন প্রথমটি নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি বৈধ। অর্থাৎ সম্পদের মালিক যদি তার সম্পদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে, তাহলে ওয়ারিসগণ সেই সম্পদের ওয়ারিস হতে পারবে না। আর অজ্ঞ থাকলে পারবে।

তবে আমাদের দৃষ্টিতে এবং ন্যায়বিচার ও শরীয়তের মূলনীতির সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো-অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকারীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। সম্পদের মালিক তা হারাম হওয়া সম্পর্কে অবগত হোক বা না হোক। অবৈধ সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের মালিক এবং উত্তরাধিকারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন (২) বাবা অবৈধ সম্পদ রেখে গেলে সন্তানদের করণীয় কী? দয়া করে জানাবেন

ফাইজুল ইসলাম, মাদারীপুর

উত্তর : সন্তানরা যদি ছোট হয় এবং হালাল অর্থ উপার্জনে অক্ষম হয়, তবে তারা তাদের পিতার অর্থ থেকে অবৈধ হলেও তা গ্রহণ করতে পারবে। তাদের অবস্থা এমন লোকের মতো, যে ক্ষতি এড়ানোর জন্য মরা জন্তুর মাংস খেতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই অবৈধ সম্পদ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"কিন্তু যে ব্যক্তি প্রয়োজনে বাধ্য হয়, সে বিদ্রোহী এবং সীমালঙ্ঘন না কারী হয়ে তা গ্রহণ করলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১] যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন বিষয়টি আবার নিষিদ্ধ ও হারাম হয়ে যায়। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, পিতার অবৈধ অর্থ গ্রহণের জন্য সন্তানদের ওপর পাপ বর্তাবে যদি তারা হালাল অর্থ উপার্জনে সক্ষম থাকে, অক্ষমতা ও প্রয়োজনের অবস্থায় নয়। তাই আমরা বলবো যে, সন্তানেরা যদি উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা তাদের পিতার হারাম সম্পদ তার আসল মালিকদের কাছে ফেরত দিবে। আর মালিক পাওয়া না গলে মুসলিমদের কল্যাণকর কাজে খরচ করবে।

প্রশ্ন (৩) : ঈদুল আযহার তাকবীর কখন থেকে শুরু হবে এবং কতদিন চলবে?

রেজাউল হক, পাবনা

উত্তর : যুল-হজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নবী ﷺ বেশি বেশি করে দু'আ করতেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকেও অধিক পরিমাণ তাকবীর, তাহমীদ এবং তাহলীল পাঠ করার আদেশ দিতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আরাফা দিবসের ফজরের সালাতের পর থেকে তাকবীর শুরু করতেন এবং আইয়্যামে তাশরীকের (কুরবানীর) শেষ দিন পর্যন্ত তা চালু রাখতেন। তাকবীরের শব্দগুলো ছিল এ রকম :

الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

[১] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১৭৩।

এই শব্দগুলো দিয়ে তাকবীর পাঠ করার হাদীসটি সহীহ না হলেও[২] এর উপরই আমল চালু হয়ে গেছে। এখানে আল্লাহু আকবার দুইবার এসেছে। প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলা জাবের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আমল ছিল। তবে উভয় শব্দে পড়াই মুস্তাহাব। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : নিম্নের বাক্যে তাকবীর পাঠ করলেও উত্তম হবে। বাক্যগুলো হচ্ছে এই :

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদুলিল-ল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসীলা।[৩]

প্রশ্ন (৪) : মহিলাদের নিকাব ও হাতমোজা পরিধান করে সালাত পড়তে হবে? না হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রাখবে?

মাজহারুল ইসলাম, নোয়াখালী

উত্তর : মহিলারা যদি নিজ গৃহে অথবা এমন স্থানে সালাত আদায় করে, যেখানে মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে না দেখে তাহলে তার জন্য শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় খোলা রাখা। যাতে করে সিজদার সময় কপাল এবং উভয় হাত মাটিতে লাগাতে পারে।

কিন্তু তারা যদি এমন স্থানে সালাত পড়ে যার আশ-পাশে পরপুরুষ রয়েছে, তাহলে অবশ্যই মুখমন্ডল ঢেকে রাখতে হবে। কেননা গাইরে মাহরামের (যার সাথে বিবাহ জায়েয) সামনে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তাদের সামনে মুখ খোলা জায়েয নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত এবং বিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির দলীল দ্বারা এটি প্রমাণিত। যা কোনো মুমিন-মুসলিম এমনকি সাধারণ বিবেকবানও বর্জন করতে পারে না।

মহিলাদের হাতমোজা পরিধান করা শরীয়ত সম্মত। মহিলা সাহাবীদের আমল দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে। নবী (ﷺ) নারীদের ইহরাম বাঁধার নিয়মের মধ্যে উল্লেখ করেছেন,

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

"মুহরিম মহিলা নিকাব পরবে না এবং হাতমোজাও পরিধান করবে না"।[৪] এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল হাতমোজা পরিধান করা। অতএব পরপুরুষের উপস্থিতিতে সালাত পড়ার সময় মহিলাদের হাতমোজা পরিধান করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সালাতের সময় তাদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার ব্যাপারে কথা হলো, তারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় তা ঢেকে রাখবে। সিজদায় যাওয়ার সময় মুখমণ্ডল খুলবে। যাতে কপাল সিজদার স্থানে বা যমিনে লেগে যায়।

প্রশ্ন (৫) : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করি এবং প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাই, সেখানে দুই দিন থাকি, এখন আমি সালাত কিভাবে আদায় করবো?

এখলাস শিকদার, নোয়াখালী

উত্তর : নিজ বাড়িতে সালাত কসর করা বৈধ নয়। এখানে আপনি দুইদিন থাকেন কিংবা এর চেয়ে বেশি থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি সেখানে সালাত কসর পড়বেন না। আপনি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই পুরো সালাত আদায় করবেন। কারণ নিজ বাড়িতে কসর নেই।

প্রশ্ন (৬) : আমি শুনেছি যে, আশুরার দিনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেছেন। তাই এই দিন মুসলিমদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। কিছু আলেমকে এই কথার প্রতিবাদ করতেও শুনেছি। দয়া করে আমাকে সঠিক বিষয়টি জানাবেন?

শফিকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ

উত্তর : ৬১ হিজরীর মুহাররম মাসের দশ তারিখ তথা আশূরার দিনে হোসাইন বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারবালায় শাহাদাতবরণ করেছেন এই কথা সঠিক। এটা

[২] অন্যান্য মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে। তাই হাদীসের দু'আ মনে করে নির্দ্বিধায় পাঠ করা চলে।

[৩] এই দু'আটিও এমনভাবে সাহাবীদের থেকে এসেছে, যার ফলে তা নবী (ﷺ)-এর শিখিয়ে দেয়া দু'আ বলে পরিগণিত হয়।

[৪] সহীহ্ বুখারী : ইহরাম অবস্থায় শিকার করার জরিমানা।

ইসলামের ইতিহাসের অন্যন্য ঘটনার মতোই একটি রাজনৈতিক ঘটনা। যারা হোসাইনকে হত্যা করেছে, তারা ইতিহাসের সেরা যালেমদের অন্যতম। কিন্তু এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশূরার দিনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ধারণা বানোয়াট। সেই সঙ্গে হোসাইনের শাহাদাতের ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুসলিম জাতি এই দিবস পালন করার দাবিও অর্থহীন। কারণ, আশূরা ও মুহাররম মাসকে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দিনই পবিত্র হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এটা চারটি হারাম মাসের মধ্যে গণ্য। যার পবিত্রতা ও মর্যাদা কারবালার ঘটনার বহু আগে থেকেই সাব্যস্ত। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা আলাইহিস সালাম তা'আলা আশূরার দিনের ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন, তাই মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এই দিন সিয়াম রেখেছেন। বনী ইসরাঈলরাও সিয়াম রেখেছে। কারবালার ঘটনার অর্ধশত বছর আগেই রাসূল ﷺ আশূরার দিন সিয়াম রেখেছেন এবং তাঁর সাহাবীদেরকে সিয়াম রাখার আদেশ দিয়েছেন। অতএব হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু আশূরার দিন কারবালায় শাহাদত বরণ করার কারণে আশূরার দিন ফযীলত ও বরকতময়, এই ধারণা বাতিল।

প্রশ্ন (৭) : আশূরার সিয়ামের ফযীলত জানতে চাই। দয়া করে জানাবেন?

হাফিজুর রহমান, সাতক্ষীরা

উত্তর : আশূরার সিয়াম বিগত বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়। দলীল হচ্ছে নবী ﷺ-এর বাণী:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি আরাফার সিয়াম বিগত বছর ও আগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে। আরো প্রত্যাশা করছি আশূরার সিয়াম বিগত বছরের গুনাহ মার্জনা করবে।[৫] এটি আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার বিরাট অনুগ্রহ যে, একদিনের সিয়ামের মাধ্যমে বিগত বছরের সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

প্রশ্ন (৮) : একজন মৃত ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে তার জীবনের অনেকগুলো রামাযান মাসের সিয়াম রাখতে পারেননি কারণে। পরবর্তীতে তিনি সেগুলো আর আদায় করতে পারেননি বা ফিদইয়াও দিতে পারেননি। আমার প্রশ্ন সেই ব্যক্তির সন্তানদের ওপর কী করণীয়? রাখতে না পারা সিয়ামের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কি আনুমানিক একটা হিসেব করে ১টি সিয়ামের জন্য ১ জন ফকির-মিসকিনকে খাবার দিলে হবে? বা কী করণীয় একটু বুঝিয়ে বললে উপকৃত হবো।

নাইমুল ইসলাম, মেহেরপুর

উত্তর : প্রথমত : যদি তিনি অসুস্থতার মতো কোনো বৈধ কারণে ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলো পূরণ করার আগেই মারা যান, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে, তার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এখন তার সন্তানদের উপরও করণীয় কিছু নেই। এর কারণ হলো, তার ওপর আল্লাহর হক ওয়াজিব হয়েছিল। কিন্তু তা পূরণ করার সময় পাওয়ার আগেই মারা গেছেন।

দ্বিতীয়ত : যদি তিনি ছুটে যাওয়া সিয়ামগুলো পূরণ করার সময় পাওয়ার পর মারা গিয়ে থাকেন, যেমন ধরুন সুস্থ হওয়ার পর সিয়ামগুলো পালন করার সময় ছিল, কিন্তু অলসতা করে বিলম্ব করেছে তবে তার পক্ষ থেকে ছুটে যাওয়া প্রতিটি দিনের জন্য একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তারা তাদের প্রমাণ হিসেবে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন, যেখানে নবী ﷺ বলেছেন,

من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً.

যে ব্যক্তি এক মাস সিয়াম নিজের উপর ফরয থাকা অবস্থায় মারা যায়, তার পক্ষ থেকে ছুটে যাওয়া প্রত্যেক দিনের জন্য একজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়াবে"।[৬]

[৫] সহীহ মুসলিম হা : ১১৬২।

[৬] সুনান তিরমিযী হা : ৭১৮, তবে হাদীসটি মারফু হিসেবে দুর্বল, মাওকুফ হিসেবে সহীহ।

প্রশ্ন (৯) : মহিলারা জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : নারীদের নিয়মিতভাবে জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি সালাফদের যুগে পরিচিত ছিল না। তবে পর্দার বিধান লংঘন হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে নারীরাও জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর দলীল হচ্ছে,

أَنَّ عائِشَةَ أَمَرَت أن يُمَرَّ بجِنازةِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ في المَسجِدِ، فتُصَلِّيَ عليه، فأنكَرَ النَّاسُ ذلك عليها، فقالت: ما أسرَعَ ما نَسِيَ النَّاسُ! ما صَلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على سُهَيلِ بنِ البَيضاءِ إلَّا في المَسجِدِ.

"আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর লাশ মসজিদে প্রবেশ করানোর আদেশ করলেন, যাতে তার জানাযার সালাত আদায় করতে পারেন। লোকেরা এতে তার প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, মানুষ কতই না দ্রুত ভুলে গেলো! নবী (ﷺ) সুহাইল বিন বায়যার জানাযার সালাত মসজিদেই আদায় করেছেন।"[৭]

প্রশ্ন (১০) : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নারীদের পোশাক সম্পর্কে জানতে চাই। তারা কেমন পোশাক পরিধান করে বাড়ি থেকে বের হবে, দয়া করে জানাবেন।

ওয়াবাইদুর রহমান, যশোর।

উত্তর : নারীরা যখন প্রয়োজনীয় কাজে বাড়ির বাইরে যাবে, তখন তাদের পোশাকের ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা হলো, তারা এমন পোশাক পরবে, যা দ্বারা মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সারা শরীর ঢেকে যায় এবং কাপড় এতটুকু মোটা হওয়া চাই, যাতে উপর দিয়ে শরীর দেখা না যায়। বর্তমানে বাজারে যেসব বোরকা পাওয়া যায়, সেগুলো নারীদের জন্য খুবই মানানসই। তবে তাতে যেন বিভিন্ন রং এর ডিজাইন না থাকে এবং সেটা যেন কালো রঙের হয়। কেননা বর্তমানে এমন কিছু বোরকা বের হয়েছে যা পর্দার মাধ্যম না হয়ে ফিতনার কারণ হয়েছে। কিছু কিছু বোরকা এমন আছে, যাতে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে নারীরা কখনো পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করবে। ইসলামী শরীয়তে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

«أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ»

"তিনি ঐসব মহিলাদের ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং তিনি ঐসব পুরুষের ওপর অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের আকৃতি ধারণ করে"।[৮]

প্রশ্ন (১১) : নারীদের মুখমণ্ডলে চুল গজালে যেমন দাড়ি-মোছ গজালে করণীয় কী?

নূরুল ইসলাম, গাইবান্ধা

উত্তর : যদি এমন কোনো চুল গজায় যা দেখতে খারাপ লাগে, তাহলে তা তুলে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই, যেমন গোঁফ ও দাড়ি। বরং নারীদের যদি পুরুষদের মতো দাড়ি-মোচ গজায়, তাহলে বিলুপ্ত করা ওয়াজিব। তবে মুখের সাধারণ চুল উঠিয়ে ফেলা উচিত নয় এবং ভ্রুর চুলেও হাত দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি নারীদের মুখে কিংবা শরীরে এমন কিছু গজায়, যা দেখতে খারাপ বা কুৎসিত লাগে, তাহলে তা তুলে ফেলা উচিত এবং **এতে কোনো ক্ষতি নেই, যেমন গোঁফ ও দাড়ি ইত্যাদি।**

প্রশ্ন (১২) : বাড়ির ভিতরের মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীরা তাদের শরীরের কোন্ কোন্ অংশ প্রকাশ করতে পারবে?

ইয়াসীন আলী, মুহাম্মদপুর

উত্তর : আলেমগণ বলেছেন যে, একজন মহিলা অপরিচিত পুরুষদের সামনে নিজেকে আবৃত রাখতে হবে এবং তাদের থেকে তার সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখবে। তবে নিকটাত্মীয়দের বিশেষ করে মাহরামদের ক্ষেত্রে আলেমগণ বলেছেন যে, তাদের কাছে

[৭] সহীহ মুসলিম হা : ৯৭৩।

[৮] সুনান আবু দাউদ হা : ৪০৯৭।

প্রথাগতভাবে যা অনাবৃত থাকে, যেমন মুখমণ্ডল, হাত ও পা, তা অনাবৃত করতে কোনো ক্ষতি নেই; এতে কোনো আপত্তি নেই। একইভাবে, মাথার চুল, বাহু এবং এই জাতীয় অঙ্গ অনাবৃত রাখা জায়েয আছে। কিন্তু ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সতর্ক থাকাই তার জন্য উত্তম। পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনা বা এই জাতীয় নিকটাত্মীয়দের কাছে এগুলো অনাবৃত করতে কোনো আপত্তি নেই। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এই ধরনের জিনিস দেখা একটি প্রচলিত রীতি, তাই এতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে তার উচিত যথাসম্ভব সতর্ক থাকা, কারণ এই যুগে কিছু নিকটাত্মীয়কে বিশ্বাস করা যায় না এবং তাদের ক্ষতি করতে পারে। অতএব সতর্কতা হিসেবে এবং যেকোনো সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর জন্য তার মুখমণ্ডল, হাত ও পা ছাড়া বাকি অংশ আবৃত রাখাই সর্বোত্তম ও উপযুক্ত।

প্রশ্ন (১৩) : মহিলাদের জন্য পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নেয়া বৈধ? বৈধ হয়ে থাকলে এর জন্য কি কোনো শর্ত আছে? দয়া করে জানাবেন।

আবু সুফিয়ান, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : যদি মহিলা ডাক্তার থাকেন, তবে আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক এবং সেক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি পুরুষ ডাক্তারের প্রয়োজন হয় এবং কোনো মহিলা ডাক্তার না থাকেন, তবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। প্রয়োজনে এটি জায়েয। তবে, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা নির্জনে করা উচিত নয়। যদি মাথা, হাত, পা ইত্যাদি দেখানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে তা একজন পুরুষ অভিভাবক (মাহরাম) বা তার স্বামীর উপস্থিতিতে দেখানো উচিত। আর যদি লজ্জাস্থানের সাথে জড়িত থাকে, তবে একজন মহিলা সঙ্গীর উপস্থিত থাকা উচিত। এটি আরো ভালো এবং অধিক সতর্কতামূলক অথবা অন্তত একজন নার্সের উপস্থিত থাকা উচিত। যদি একজন মহিলা নার্স থাকেন, তবে তা আরো উত্তম, অধিক সতর্কতামূলক এবং সন্দেহ থেকে আরো দূরে রাখে। আর নির্জনতার ব্যাপারে বলতে গেলে, তা কখনোই জায়েয নয়। সুতরাং মহিলার স্বামী ও অভিভাবকদের এই বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত এবং নারীদের এ বিষয়ে আরও বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। তাদের অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং সকল পরিস্থিতিতে প্রলোভন ও সন্দেহের কারণগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু বিশেষ করে কোনো পুরুষ ডাক্তারের ক্ষেত্রে তিনি যতই সৎ, বিশ্বস্ত বা অন্য যেকোনো গুণের অধিকারী হোন না কেন, তার সাথে একা না থাকার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৪) : কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর আছে। এটা বলে পুরুষদেরকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য এমনটা আমরা দেখতে পাই না। তাহলে নারীরা কি হুর পাবে না?

জুবায়ের শেখ, উত্তরা

উত্তর : জান্নাতে এমন কিছু রয়েছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মন কল্পনাও করেনি। এই পুরস্কার যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই প্রতিশ্রুত। যদি কোনো নারী জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকেও এমন কিছু দান করবেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মন কল্পনাও করেনি। সেখানে সে তাই পাবে যা তার আত্মা কামনা করে, যেমন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর কিতাবে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন।

অতএব এই প্রশ্নগুলো অপ্রাসঙ্গিক। যখন একজন মুমিন পুরুষ ও নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা প্রত্যেকেই সেখানে তাই পাবে, যা তারা কামনা করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা অনুসারে নারীকে এমন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করাবেন, যা তার জন্য সম্ভব অথবা যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার জন্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে সে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত সুখ লাভ করতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে যা দিবেন, তা ছাড়া সে অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবে না এবং যা তার জন্য সম্ভব তা ছাড়া অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষাও করবে না। আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিই একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য এ বিষয়ে

নিশ্চিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে সে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত পরম সুখ ভোগ করবে এবং এমন এক সুখ পাবে, যার পরে আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

অতএব এ বিষয়ে অতিরিক্ত গভীরে প্রবেশ করা এবং নারী-পুরুষের তুলনা করা এক নিন্দনীয় একগুঁয়েমি ও সময়ের অপচয়। একজন বিশ্বাসীর উচিত তার জন্য যা উপকারী, সেদিকে মনোনিবেশ করা। নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন, احرص على ما ينفعك "যা তোমার জন্য উপকারী, তার জন্য আগ্রহী হও"। এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রয়োজন সেইসব কাজ ও উপায়ের দিকে মনোযোগ ও প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা, যার মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায়। এগুলো অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তার কল্পনাতীত মহা পুরস্কার দান করবেন। পুরুষদের মতোই নারীদেরও এই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই পুরস্কারের বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন। অতএব আমাদের সাথে সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন এবং এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করেন, যা আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি পরম দয়ালু ও দাতা।

☞ প্রশ্ন (১৫) : ইয়াযীদ সম্পর্কে আমাদের আকীদাহ কেমন হওয়া উচিত?

সিরাজুল হক, বাগেরহাট

উত্তর : তাফসীর, হাদীস, আকীদাহ এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াজিদের উপর লানত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। কেউ তার নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লাআনাহুল্লাহ- এ দু'টি বাক্যের কোনটিই উল্লেখ করেননি। সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভালো-মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দিবেন।

ইমাম যাহাবী ইযাযীদের ব্যাপারে বলেন : لانسبه ولانحبه অর্থাৎ আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না। মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরো যেসব পাপ কাজের অপবাদ ইয়াজিদের প্রতি দেয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হোসাইন যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং তিনি মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন : আমার উম্মতের একটি দল কুস্তনতীনিয়ায় যুদ্ধ করবে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াযীদ বিন মুয়াবীয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হোসাইন তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াজীদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে।

☞ প্রশ্ন (১৬) : মহিলাগণ কি পরপুরুষদের সামনে তাদের চেহারা বা মুখ-মণ্ডল খুলতে পারবে? দয়া করে জানাবেন।

হাসানুজ্জামান, গবিন্দগঞ্জ।

উত্তর : সবচেয়ে সঠিক মত, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত তা হলো, পরপুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তাই একজন যুবতী মহিলা অ-মাহরাম পুরুষদের সামনে তার মুখ-মন্ডল প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক। যাতে দুষ্ট পুরুষদের প্রলোভনের শিকার না হয়।

তবে আলেমগণ বলেছেন যে, কোনো অযুহাতে থাকলে এবং বিশেষ প্রয়োজন থাকলে মহিলাগণ অমাহরাম

পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। যেমন বিয়ের প্রস্তাব দানকারী পুরুষের সামনে মহিলা তার মুখ খুলতে পারবে। সাহল বিন সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها

"এক মহিলা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে নিজেকে দান করে দেওয়ার জন্য এসেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং তার দিকে তার মাথা উচু করলেন এবং তার তাঁর মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি তা দেখল তিনি তার সম্পর্কে কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়লো। অতঃপর তার সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো: হে আল্লাহর রাসূল, আপনার যদি তার কোন প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন।[৯] এতে বুঝা গেলো, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে মহিলার চেহারার দিকে তাকানো যাবে। অনুরূপ কেনাবেচা ও লেনদেনের প্রয়োজনে, চিকিৎসার প্রয়োজনে, সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজনে, বিচার-ফয়সালার সময়, শিশু বাচ্চাদের সামনে, পুরুষত্বহীনদের সামনে এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাগণ পুরুষদের সামনে মুখ খুলতে পারবে। অনুরূপ অতি বৃদ্ধারাও মুখ খুলতে পারবে। আর হজ্জ-উমরার ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ একাকী চলার সময় মুখ খোলা রাখা আবশ্যক। তবে পুরুষেরা যখন তাদের পাশ দিয়ে চলবে অথবা তারা যখন পুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন মাথার উপর থেকে চেহারার উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিবে। তবে নিকাব পরে মুখ ঢাকবে না কিংবা হাতমোজা পরিধান করে হাত ঢাকবে না। আর ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে إلا ما ظهر منها এর ব্যাখ্যায় যেটা এসেছে যে, তিনি বলেছেন, মহিলাগণ অমাহরাম পুরুষদের সামনে চোহারা মুখ খুলতে পারবে, তা সঠিক নয়। এর আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা বাড়ির ভিতরে মাহারাম পুরুষের সামনে হাত ও মুখ খুলতে পারবে। বাড়ির বাইরে এবং পরপুরুষের সামনে তা খোলার সুযোগ নেই।

[৯] সহীহ বুখারী ৭/১৯, সহীহ মুসলিম ৪/১৪৩।

প্রশ্ন (১৭) : বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার আগে দু'রাক'আত সালাত পড়ার হুকুম কী?

খাইরুল হক, রাজশাহী

উত্তর : বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার পূবে স্বামীর পরিহিত বস্ত্রের সাথে স্ত্রীর পরিহিত পোষাক বেধে যে দুই রাক'আত সালাত আদায় করার প্রথা প্রচলিত আছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে প্রত্যেকেই আলাদাভাবে আল্লাহর কাছে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশের শুকরিয়া স্বরূপ দুই রাক'আত সালাত আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, বিবাহের রাতে স্ত্রীর সাথে বাসর করার আগে দু'রাক'আত সালাত পড়ার কথা কতিপয় সাহাবীর আমল দ্বারা সাব্যস্ত। তবে আমি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে কোনো সহীহ্ হাদীস পাইনি। অবশ্য বাসর রাতে শরীয়ত সম্মত হচ্ছে, নববধুর কপাল ধরে এই দু'আ পাঠ করবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"হে আল্লাহ!, তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং একে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় কামনা করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং একে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছো তার অকল্যাণ থেকে।"[১০]

এরকম করলে স্ত্রী ভীত হবে বা অপছন্দ করবে এমন আশঙ্কা থাকলে নিকটবর্তী হওয়ার ইচ্ছা করে তার কপালে হাত রেখে তাকে না শুনিয়ে চুপে চুপে উক্ত

[১০] আবু দাউদ, অধ্যায় : কিতাবুন নিকাহ।

দু'আটি পাঠ করবে। কেননা কোনো কোনো মহিলা এরকম ধারণা করতে পারে যে, আমার মধ্যে কি অকল্যাণ আছে?

আমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করা। সেই সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত মোতাবেক ইবাদত করা আবশ্যক। আমরা সেই অনুযায়ী আমল করবো। তবে তা কবুল হলো কি না, তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে আলেমগণ ইবাদত কবুল হওয়ার বেশ কিছু আলামত উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে হজ্জ কবুল হওয়ার লক্ষণগুলো উল্লেখ করছেন। তা হলো হজ্জকারী হজ্জ শেষে তার রবের আনুগত্যে অবিচল থাকবে এবং হজ্জের পর তার অবস্থা আগের চেয়ে ভালো থাকবে। এটি হজ্জ কবুল হওয়ার বিরাট একটি লক্ষণ। সালাফদের কেউ কেউ বলেছেন, "কবুল হওয়া হজের একটি লক্ষণ হলো, ফিরে আসার পর নেক আমল বৃদ্ধি পাওয়া এবং পাপে ফিরে না যাওয়া। হাসান বাসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, কবুল হওয়া হজ্জ হলো সেটি, যার সম্পাদনকারী পার্থিব কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে এবং পরকালের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিরে আসে।

সুতরাং হে আমার হজ্জযাত্রী ভাই-বোনেরা, এই লক্ষণগুলো অন্বেষণ ও অর্জন করার জন্য চেষ্টা করুন, যাতে আপনি আল্লাহর পুরস্কার ও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন।

প্রশ্ন (১৮) : তাহাজ্জুদ সালাতের সময় কখন থেকে শুরু হয় এবং কখন শেষ হয়?

বরকতউল্লাহ, রাজবাড়ী

উত্তর : তাহাজ্জুদ সালাতের সময় শুরু হয় এশার সালাতের পর থেকে এবং শেষ হয় ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে। রাতের প্রথমাংশে, মধ্যরাতে এবং শেষাংশে যে কোনো সময়ে তাহাজ্জুদ পড়া যায়। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাতের যে কোনো অংশে নবী (ﷺ)-কে সালাত পড়তে দেখতে চাইতাম, সে সময়ই দেখতে পেতাম, তিনি সালাত পড়ছেন। আবার রাতের যে কোনো অংশে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তখনই আমরা দেখতে পেতাম, তিনি ঘুমিয়ে আছেন।[১১]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, এশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত সময়ের ভিতরে তাহাজ্জুদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। অবশ্য আফযল বা উত্তম সময় হল, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আমায় ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।[১২]

প্রশ্ন (১৯) : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা- কথাটি কি ঠিক? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কী?

এনামুল হুদা, কিশোগঞ্জ

উত্তর : জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা-এ কথাটি ঠিক। কেননা নবী ﷺ একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ করে বলেছেন,

(يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ)

"হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে সাদাকা কর। কারণ আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে- এই প্রশ্ন নবী ﷺ-কে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে মানুষের ওপরে অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার কর।"[১৩] নবী ﷺ এ হাদীসে নারীদের বেশি হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশি পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে, এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

---

[১১] মিশকাত হা : ১২৪১।
[১২] সহীহ বুখারী, হা : ৬০২১।
[১৩] সহীহ বুখারী, অধ্যায় : কিতাবুল হায়য।

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	”	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	”	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	”	৩২/-
৫	তারাবীহ	”	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	”	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	”	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	”	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	”	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	”	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	”	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	”	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	”	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

“বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

“বিকাশ নম্বর”
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

“সাপ্তাহিক আরাফাত”
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

আসসালামু আলাইকুম

আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স

দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক
৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।